স্বস্তিকা

৮ আগষ্ট - ২০১১, ২২ শ্রাবণ - ১৪১৮ ।।
৬৩ বর্ষ, ৪৭ সংখ্যা

দাম : পাঁচ টাকা

২২শে শ্রাবণ স্মরণে..

ত্রিদণ্ডী স্বামী পরাঙ্কুশ মহারাজের পুণ্য স্মৃতিতে

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ❑

সংবাদ প্রতিবেদন ❑

কেন্দ্রের সঙ্গে সংঘাতের পথেই যাচ্ছেন মমতা ব্যানার্জী ❑

'মার মা বদলা মার' নীতি কি ফিরে আসছে? ❑

বাম জমানায় ধ্বংসপ্রাপ্ত শিক্ষার সংস্কার হওয়া প্রয়োজন ❑ দেবীপ্রসাদ রায় ❑

নগদ অর্থ দিয়ে ভর্তুকি মেটানো কি আরও ভাল বিকল্প? ❑
ডঃ ভরত ঝুনঝুনওয়ালা ❑

ত্রিদণ্ডী স্বামী পরাঙ্কুশ রামানুজ মহারাজ : এক প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ
❑ বাসুদেব ঘোষ ❑

পরাঙ্কুশ মহারাজের সব বিষয়ই ছিল মর্মস্পর্শী : স্বামী রাম রামানুজ ❑

রবীন্দ্র ভবনের 'দৃশ্যমান অভিলেখ্যাগার' ব্যবহার করতে পারবেন গবেষকরা ❑

রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প, ভাবনা ও বিশ্লেষণ ❑ ডঃ সৌমিত্র মুখোপাধ্যায় ❑

সাহিত্যের পাতা - সেদিন অমরকন্টকে ❑ মানিকচন্দ্র দাস ❑

সাহিত্যের পাতা - স্বপ্নে আমার মিতা ❑ তারক সাহা ❑

আদি কলকাতার বনেদিবাড়ির ঝুলন ❑ নির্মল কর ❑

স্মরণ : আমার দেখা মিতব্যয়ী প্রচারক সুকুমারদা ❑ উত্তমকুমার মাহাতো ❑

পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্তন প্রসঙ্গে ❑ শিবাজী গুপ্ত ❑

যোগ্য দল হিসেবেই কোপা জিতল উরুগুয়ে ❑ জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ❑

স্বাধীনতা সংগ্রামী, শিক্ষাবিদ ডঃ ফুলরেণু গুহ ❑ মিতা রায় ❑

নিয়মিত বিভাগ

এইসময় : ❑ অন্যরকম : ❑ শব্দরূপ : ❑ চিঠিপত্র :

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

ত্রিদণ্ডী স্বামী পরাঙ্কুশ রামানুজ মহারাজ — ১৪-১৬

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৩ বর্ষ ৪৭ সংখ্যা, ২২ শ্রাবণ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৩, ৮ আগষ্ট - ২০১১

দাম : ৫ টাকা

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Registration No.-Kol.RMS/048/2010-2012

LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT

L. No.-MM & P.O. / SSRM-KOL.RMS RNP-048/LPWP-028/2010-12

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

সম্পাদকীয়

বার্তালাপের বাস্তবতা

পারস্পরিক আস্থাবর্ধক প্রক্রিয়া সচল রাখা হইবে— সম্প্রতি দিল্লীতে ভারত ও পাকিস্তানের দুই বিদেশমন্ত্রী এস এম কৃষ্ণ ও হিনা রববানি খারের বৈঠকে এই নির্যাসই উঠিয়া আসিয়াছে। আলোচনা ফলপ্রসূ ও ইতিবাচক হইয়াছে বলিয়া উভয়েই যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে জানাইয়াছেন। ভারত-পাক আলোচনার শেষে এই ধরনের যৌথ বিবৃতি নতুন কিছু নহে। এইবারে সেই 'সদিচ্ছা'র কথা পাকিস্তান আরও একবার জানাইয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন হইল, ভারত কি পাকিস্তানের উপর বিশ্বাস বা আস্থা রাখিতে পারে? কিংবা পাকিস্তান কি এমন কিছু করিয়াছে যাহার জন্য ভারত আবার তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে? পাকিস্তানে মুম্বাই আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে মামলার কতখানি অগ্রগতি হইয়াছে? পাকিস্তান কি ওই মুম্বাই আক্রমণে ষড়যন্ত্রীদের আদৌ শাস্তি দিতে চায়? ওইসব অপরাধীদের আড়াল করিতে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আই এস আই যে ব্যবস্থা লইয়াছে, তাহার কি কোনও নড়চড় হইবে? পাকিস্তানকে এখন কাহারা চালাইতেছে— আই এস আই না নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা? এই ধরনের কিছু প্রশ্ন যাহা এড়াইয়া যাওয়া যায় না। ভারতে আসিয়া বিদেশমন্ত্রী এস এম কৃষ্ণর সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া হিনা রববানি কেন কাশ্মীরী বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন? এই কথা সত্য যে ভারতের পক্ষে স্পষ্টই জানাইয়া দেওয়া উচিত ছিল— এই ধরনের বার্তালাপ উদ্বেগজনক। এই বিষয়ে ভারতের কণ্ঠস্বর আরও কঠোর হওয়া উচিত ছিল। পাকিস্তানে যাইয়া রববানির সহিত সাক্ষাতের আগে বালুচিস্তানের বিদ্রোহীদের সহিত এস এম কৃষ্ণ যদি সাক্ষাৎ করিতেন তাহা হইলে কি হইত? পাকিস্তান কিভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করিত? ভারতের পক্ষে এই কথা এখনও স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিবার সময় আছে যে ইহার পর আর কোনও পাকিস্তানী নেতা যদি দিল্লীর সঙ্গে বৈঠকের আগে কাশ্মীরী বিচ্ছিন্নতাবাদীর সহিত বৈঠক করেন, তবে তাহাকে কোনওরূপ স্বীকৃতি দেওয়া হইবে না। ইহা কোনও প্রতিশোধমূলক সিদ্ধান্ত নয়—জাতি হিসাবে ভারতের আত্মমর্যাদার প্রশ্ন।

ভবিষ্যতে আই এস আই-এর প্রসঙ্গটি লইয়া ভারতের সোচ্চার হওয়া উচিত। পাক-সেনাবাহিনীর এই গোয়েন্দা সংস্থা শুধু পাক-সেনারই গোয়েন্দা শাখা নয়, এই সংস্থা সন্ত্রাসবাদীদের মদতদাতা এবং একই সঙ্গে ভারতে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে কোনও লেনদেন নাই বলিয়া পাকিস্তান সরকার যে হাত ধুইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহা কোনওমতেই বরদাস্ত করা হইবে না। বস্তুত আমরা মনে করি, প্রত্যেকটি আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্রে সন্ত্রাসবাদ রুখিতে আই এস আই-এর বিষয়টি লইয়া ভারতের সোচ্চার হওয়া দরকার। বিশ্বের বিভিন্ন মহল হইতে আই এস আই-এর উপর সন্ত্রাসবাদী তকমা লাগাইবার দাবী উঠিতেছে, তাহা যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত। হ্যাঁ, পাকিস্তানসহ সকল প্রতিবেশী দেশগুলির সহিত আমরা সম্পর্ক চাই। এমনকী স্থিতিশীল পাকিস্তানও দেখিতে চাই। কিন্তু বর্তমানের বাস্তবতাকে আমরা এড়াইয়া যাইতে পারি না। আমাদেরকে নিশ্চিতভাবে এই বাস্তবতার মোকাবিলা করিতে হইবে। যে যেমন আচরণ করিবে, তাহার সহিত তদনুরূপই আচরণ করিতে হইবে। কেননা, পাকিস্তানের জেহাদী সন্ত্রাসীদের নৃশংস শিকার ভারতই।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

ভারত খণ্ডিত হয়েছে আমাদের অসতর্কতা এবং সাংগঠনিক দুর্বলতার ফলে। এজন্য দুঃখ করার কিছু নেই। ভারতের কোনও কোনও অংশ কোনও না কোনও সময়ে পরপদানত হয়েছে, কিন্তু আমরা আবার তাকে উদ্ধার করেছি। এখন ভারতের যতটা অংশের স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি, তাকে যদি প্রচণ্ড শক্তিশালী করে তুলতে পারি, আর আমরা যদি সুসংগঠিত হই, তাহলে বিচ্ছিন্ন অংশগুলি পুনরুদ্ধার করে পুনরায় ভারতের সঙ্গে যুক্ত করা দুঃসাধ্য হবে না।

—স্বাতন্ত্র্যবীর সাভারকর

কোঠারী ভাইদের বলিদান না হলে ৬ ডিসেম্বর হোত না : সাধ্বী ঋতাম্ভরা

রাম-শরদ প্রতিভা সম্মান অনুষ্ঠান-মঞ্চে বাঁ দিক থেকে মনমোহন গারোদিয়া, জয়নারায়ণজী, বিমল লাট, তরুণ বিজয়, সাধ্বী ঋতম্ভরা, বীরমাতা সুমিত্রা দেবী কোঠারি, সমীর গাঙ্গুলী ও ইন্দ্রসেন সিংঘল।

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সরকার বারবার রামমন্দির নির্মাণের বিষয়টি উপেক্ষা করলেও ''রাম জী কা মন্দির বনেগা ধুমধাম সে''— এই উদ্‌ঘোষের পরই উদ্বেলিত হয়ে উঠল 'ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে'র বিরাট সভাগার। অন্তরের অন্তস্থল থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে এলো এই উদ্‌ঘোষ। দিদি-'মা' হিসাবে পরিচিতা সর্বজনশ্রদ্ধেয়া সাধ্বী ঋতাম্ভরা গত ৩১ জুলাই কলকাতায় রাম-শরদ প্রতিভা সম্মান প্রদান অনুষ্ঠানে এই উদ্‌ঘোষ দেন। তিনি আরও বললেন, ব্যর্থ হবে না মা-সুমিত্রার চোখের জল। ব্যর্থ হবে না রাম-শরদের বলিদান। শ্রীরামন্দির নির্মাণ কোনও একটি রাজনৈতিক দলের একচেটিয়া নয়। তাদের নিজের ঝাণ্ডা-এজেণ্ডা আছে। ওই বিতর্কিত ধাঁচা আদৌ মসজিদ ছিল না। মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ থেকে খাড়া করা কাঠামো মাত্র। ১৯৯০-র ২ নভেম্বর ঘর থেকে টেনে বের করে পুলিশ রাম-শরদের মাথায় গুলি করেছিল। ২ নভেম্বর না হলে ৬ ডিসেম্বর হোত না। হিন্দুরা কখনও অন্যের ধর্মস্থান দখল করেনি। সুপ্ত হিন্দু সমাজকে তাই জাগাতে হবে। ভি পি সিং সরকারের 'মণ্ডল কমিশনে'র রাজনীতিকে রামমন্দির আন্দোলনই স্তব্ধ করে দিতে পেরেছিল। 'জয় শ্রীরাম' ভাবনাই এদেশকে এক পারস্পরিক মারণ-যজ্ঞের হাত থেকে রক্ষা করেন। বিজেপি আন্দোলনকে সমর্থন করেছে, লাভও পেয়েছে। ঋতাম্ভরা রাম-শরদের বলিদানের কথা নতুন যুব প্রজন্মকে জানাতে আহ্বান জানান। সৌন্দর্যমণ্ডিত শ্রীরামমন্দির নির্মাণই রাম-শরদের প্রতি সত্যিকারের শ্রদ্ধার্ঘ্য বলে তিনি মন্তব্য করেন। প্রধান বক্তা ছিলেন সাংসদ ও বিজেপি-র অন্যতম মুখপাত্র তরুণ বিজয়। তিনি বলেন, ১৯৯০-এর করসেবার সময় ২৯ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর তিনি নিজে অযোধ্যাতেই ছিলেন। ফৈজাবাদের কমিশনার মধুকর উপাধ্যায় ও এস এস পি সুভাষ যোশীর বর্বরতা স্বচক্ষে দেখেছেন। হিন্দুত্ব-প্রেমী সরকারও তাদের শাস্তি দিতে পারেনি। ইতিহাস এদের ক্ষমা করবে না। রামমন্দির সব বিভেদের প্রাচীর ভেঙে সবাইকে একসূত্রবদ্ধ করেছিল। এসময়ে আমরা এক কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে চলেছি। ভারতকে বেচে দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে। তিনি সবাইকে সাবধান করে দেন। শহীদ কোঠারী ভ্রাতৃদ্বয়, রাম-শরদ-এর স্মরণে এদিন রাম-শরদ স্মৃতি সঙ্ঘ রাম-শরদ প্রতিভা সম্মান প্রদান করে তিনজন সমাজসেবীকে। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সুধা জৈন এবং ধন্যবাদ জানান সঞ্জয় মণ্ডল। বীরমাতা সুমিত্রা দেবী কোঠারী, বিমল লাট, জয়নারায়ণ আগরওয়াল, মনমোহন গারোদিয়া প্রমুখ মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন। পৌরোহিত্য করেন প্রাক্তন ডি সি সমীর গাঙ্গুলী।

ভারত-মহাসাগরে স্থায়ীভাবে চীনের যুদ্ধজাহাজ ?

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারত মহাসাগরে ফের অশনি-সংকেত। মধ্য ভারত মহাসাগরে গভীর সমুদ্রে খনিজ ভাণ্ডারের ছাড়পত্র একটি আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর কাছ থেকে ইতিমধ্যেই করায়ত্ত করেছে চীন। ভারতের প্রতিরক্ষা ও বিদেশ—উভয় মন্ত্রকেরই আশঙ্কা বেজিং এই সুযোগটা কাজে লাগিয়ে ওই অঞ্চলে তাদের যুদ্ধ জাহাজ নিয়ন্ত্রণের কৌশল নিয়েছে। প্রসঙ্গত, গত ১৯ জুলাই ইন্টারন্যাশনাল সী-বেড অথরিটি দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতীয় সীমারেখা বরাবর চীনকে সমুদ্রগর্ভে খনন করার আন্তর্জার্তিক ছাড়পত্র দেয় তাদের অনুরোধের ওপর ভিত্তি করে। ডিরেক্টরেট অব্ নেভাল ইন্টেলিজেন্স (ডি এন আই) এবিষয়ে ভারত-সরকারকে সতর্ক করে বলেছে—''চীন ভারত মহাসাগর এলাকায় সব-সময় তাদের উপস্থিতি বজায় রাখতে চাইছে। প্রথমত, ভারতের ওপর নজরদারি চালানো আর দ্বিতীয়ত, ভারত মহাসাগরের ওপর তাদের দখল কায়েম রাখা— এটাই তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। বর্তমানে ভারত মহাসাগরে সর্বক্ষণ তাদের যুদ্ধ-জাহাজ রাখার সুযোগ করে দিলে সমুদ্রে'র খুঁটি-নাটি অনুসন্ধান (ওশনোগ্রাফিক) এবং জলানুসন্ধান (হাইড্রোলজিক্যাল) অনবরত চালিয়ে যেতে পারবে চীন। যার ফলে ভারতের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার প্রয়োজনীয় রসদ তারা পেয়ে যাবে।''

যদিও চীন দাবী করছে খনিজের ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়া চাহিদা-কে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু ডি এন আই-এর নোটে একথাও বলা রয়েছে, 'চীনের একমাত্র লক্ষ্য যে এটা নয় তা তাদের সেনাবাহিনীর সন্নিবেশ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। ভারতীয় নৌ-বাহিনীর নজরদারি বর্তমানে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বিদেশ-মন্ত্রকের পূর্ব-এশিয়া শাখার পক্ষ থেকে চীনের এই পদক্ষেপকে 'উদ্বেগজনক' আখ্যা দিয়ে মন্তব্য করা হয়েছে যে প্রয়োজনে আইনী পথও গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে বিদেশ-মন্ত্রকের পূর্ব-এশিয়া শাখার আইনী বিভাগের মতে, কোনও রাষ্ট্রের জাতীয় বিচার-ব্যবস্থার (ন্যাশনাল জুড়িসডিকশান) অন্তরালে চীনের মতো এহেন 'খনিজ কার্যকলাপ' কেউ চালালে ভারতের পক্ষে বিশেষ কিছু করার থাকে না।

রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত চীনা ওশান মিনারেল রিসোর্সেস রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন গত বছরের মে মাসে এ নিয়ে লাইসেন্সের আবেদন জানায়। দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতীয় সীমান্তে পলি-মেটালিক সালফাইড খনিজ উদ্ধারের ছাড়পত্র পাওয়ার জন্যই তাদের ওই আবেদন। আগামী কিছুদিনের মধ্যেই ইন্টারন্যাশানাল সী-বেড অথরিটির সঙ্গে একটি নব- পর্যায়ের চুক্তি সম্পাদিত হতে চলেছে যাতে বলা হচ্ছে আগামী ১৫ বছরে ১০,০০০ বর্গ কিলোমিটার সমুদ্র জুড়ে পলিমেটালিক সালফাইড খনি খনন করার কাজ চালাবে চীন।

ভারত-মহাসাগরে চীনের আক্রমণ কোনও নতুন ঘটনা নয়। কিন্তু শুধু নৌ-বাহিনীর শক্তি-পরীক্ষাতেই বিষয়টা আর আটকে নেই। এমন আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক স্তরে এই বিষয়টা পৌঁছে সরকার অবিলম্বে এ নিয়ে কঠোর না হলে আগামীদিনে আরও ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হবে ভারত।

কম্যুনাল ভায়োলেন্স বিল পাশ হলে অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত ও বহিষ্কার করা যাবে না

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সারা দেশ জুড়ে 'প্রস্তাবিত প্রিভেনসান অফ কম্যুনাল অ্যান্ড টার্গেটেড ভায়োলেন্স বিল ২০১১'-এর বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। বিশ্বহিন্দু পরিষদ ও বজরঙ্গ দলের উদ্যোগে গত ২৫ জুলাই ভারতের সব জেলায় ধর্না, বিক্ষোভ প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জেলাশাসক ও সেইসঙ্গে রাজ্যপালের উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি পাঠানো হয়েছে। বিলটি আইনে পরিণত হলে সম্ভাব্য কি কি বিপদের মুখোমুখি হতে হবে, বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তারা তা তুলে ধরেন। বিশেষত অসমের ভূমিপুত্রদের প্রতিবাদের ভাষাটুকুও এই বিল আইনে পরিণত হলে কেড়ে নেওয়া হবে। গত ২৭ জুলাই গুয়াহাটিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মুখপাত্র নয়ন রঞ্জন বরুয়া ও বজরঙ্গ দলের সুভাষ চৌহান এই অভিযোগ করে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। শ্রী চৌহান বলেন, যদিও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রোধ করাই এই বিলের উদ্দেশ্য বলে বলা হচ্ছে, কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা

যায় যে এই বিল আইনে পরিণত হলে ইতিমধ্যে সম্প্রদায়গতভাবে বিভক্ত সমাজ আরও খাড়াখাড়ি ভাবে বিভক্ত হয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, এই আইন রাজ্য সরকারের কাজকর্মেও হস্তক্ষেপ করতে প্ররোচিত করবে অর্থাৎ দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রশাসনিক ব্যবস্থাতেও আঘাত হানবে। শুধু তাই নয়, তারা মনে করেন, এই বিল সংবিধানের মূলগত কাঠামোর ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি করবে। তাঁদের বক্তব্য, এই বিল অসমের ক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক। কেননা বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা আজ অসমে আর্থ-সামাজিক সমস্যা শুধু নয়, একই সঙ্গে জাতির সার্বভৌমিকতার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জও বটে। এই বিলের শর্ত অনুসারে অসমের কোনও সংগঠনই বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত ও বহিষ্কারের জন্য কোনও দাবীই জানাতে পারবে না।

এই বিলের প্রতিবাদে কলকাতায় এদিন একটি প্রচার গাড়ী বরাহনগর বাজার, শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড় প্রদক্ষিণ করে। এইসব স্থানের সমাবেশে বক্তব্য রাখেন স্বামী তিতিক্ষানন্দজী, স্বামী পরাশরন মহারাজ, বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী, স্বামী অসীমানন্দ মহারাজ অধিবক্তা পরিষদের জয়দীপ রায়, হিন্দু জাগরণ মঞ্চের দিলীপ ঘোষ, পীতারুণ মুখার্জী, অশোক দুবে, অরিন্দম কর প্রমুখ। মালদা জেলাতে এই বিলের প্রতিবাদে সারাদিন ধরে ধর্না ও পথসভা হয়। সন্ধিৎ মিশ্র, বি এম এসের নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের গৌতম সরকার, গুরুপদ মিশ্র প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

সরকারের সঙ্গে আলোচনায় মাওবাদীদের মাথা কারা?

নিজস্ব প্রতিনিধি।। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মাওবাদীদের আলোচনার টেবিলে বসার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি সেইসঙ্গে এটাও ঘোষণা করেছেন বার্তাকারীদের তাঁর সরকার 'সেফ প্যাসেজ' অর্থাৎ নির্বিঘ্নে ফিরে যাবারও কথা দিচ্ছেন, কিন্তু রাজ্যের স্বরাষ্ট্র বিভাগের অফিসাররা ভেবে কূল-কিনারা পাচ্ছেন না কাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন? মাওবাদী সন্ত্রাসীদের মাথা বা নেতা কারা? জঙ্গলমহলে কে বা কারা নেতৃত্ব দিচ্ছে তাও সবার জানা নেই। গোয়েন্দা সূত্র অনুসারে জঙ্গলমহলের তিনটি জেলায়—মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায় ১১০ জন কট্টর মাওবাদী এবং তাদেরই বিভিন্ন শাখা সংগঠনের ৯১ জন সদস্য সক্রিয় রয়েছে। পুরুলিয়া স্কোয়াডের সদস্য সংখ্যাই ৩৭ জন। তাদেরকে নেতৃত্ব দিচ্ছে ভয়ঙ্কর দুঃসাহসিক মাওবাদী বিক্রম। তার হাতে সবসময় ধরা থাকে ইনসাস অথবা এ কে ৪৭ রাইফেল। বিক্রমই স্কোয়াডের প্রমুখ হিসেবে টপ সিক্রেট খবর আদান-প্রদানের অধিকারী। দ্বিতীয় বড় স্কোয়াড পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বেলপাহাড়ী এলাকায় সক্রিয়। তাদেরকে চালনা করে মদন মাহাতো। তার ১৭ সদস্যের স্কোয়াডের সবার হাতেই আছে অত্যাধুনিক এ কে ৪৭ রাইফেল। সংবাদ সূত্র অনুসারে ৩৯ সদস্য বিশিষ্ট পুলিশি সন্ত্রাস বিরোধী জনগণের কমিটিই সবথেকে বড় শাখা সংগঠন। নেতা ছত্রধর মাহাতো। ছত্রধর বর্তমানে জেলে—বিচার চলছে। ২ নম্বর বড় শাখা সংগঠন হলো— ৩৬ সদস্যের 'আদিবাসী মূলবাসী জনগণের কমিটি'। তৃতীয় সংগঠন— সিধু-কানু গণমিলিশিয়া, নেতা সুদর্শন মাহাতো। সদস্য ১৬ জন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের একজন অফিসারের বক্তব্য— "আমরা জানি না সেখানে আদৌ কোনও কেন্দ্রীয় কম্যান্ড আছে কি না! এটাও জানা নেই তাবৎ মাওবাদীরা কাদের কথায় চলে? তবে ফল ফললেই হলো।" আলোচনার প্রস্তাব যিনি এনেছেন, সেই মানবাধিকার কর্মী সুজাত ভদ্রও বলেছেন— তাঁর জানা নেই কে বা কারা আলোচনার টেবিলে আসবে।

স্কোয়াড	জেলা	জনবল	নেতা	শাখা সংগঠনের নাম
পুরুলিয়া	পুরুলিয়া	৩৭	বিক্রম	
বান্দোয়ান	পুরুলিয়া	১০	দীপঙ্কর	পিপলস্ কমিটি এগেন্স্ট পুলিশ এট্রোসিটিজ (৩৯) ছত্রধর মাহাতো
বেলপাহাড়ী	পশ্চিম মেদিনীপুর	১৭	মদন মাহাতো	
ঝাড়গ্রাম (পূর্ব)	,,	৬	সুরজ	সিধু-কানু গণ মিলিশিয়া (১৬)
ঝাড়গ্রাম (পশ্চিম)	,,	৯	সুজয় মুর্মু	
জামবনী	,,	৫	সুচিত্রা মাহাতো	সুদর্শন
বিনপুর	,,	৭	সুভাষ চিনারাম	আদিবাসী মূলবাসী জনগণের কমিটি (৩৬)
নয়াগ্রাম	,,	৮	রঞ্জন মুণ্ডা	

গূঢ়পুরুষের

কলম

কেন্দ্রের সঙ্গে সংঘাতের পথেই যাচ্ছেন মমতা ব্যানার্জী

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ধীরে ধীরে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের সঙ্গে সঙ্ঘাতের পথেই চলতে শুরু করেছেন। ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা দখলের পর জ্যোতি বসুরাও ঠিক এমনই সঙ্ঘাতের পথই বেছে নিয়েছিলেন। এর প্রধান উদ্দেশ্য, রাজ্যের জনগণকে বিভ্রান্ত করা। নিজেদের ব্যর্থতা থেকে মানুষের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া। বামফ্রন্ট প্রথম ক্ষমতায় আসার পর প্রচুর জনমোহিনী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। যে সব প্রতিশ্রুতির দশ শতাংশও কার্যকর হয়নি। হওয়াটা সম্ভব ছিল না। তাই নিজেদের ব্যর্থতার দায় কেন্দ্রের উপর চাপিয়ে দিয়ে বামপন্থীরা দিব্যি ৩৫ বছর রাজত্ব চালিয়ে গেছে। মমতাও বামপন্থীদের দেখানো পথেই হাঁটছেন। ক্ষমতায় আসার প্রথম দু'মাসেই তিনি যত প্রতিশ্রুতি যত উন্নয়ন প্রকল্পের ঘোষণা করেছেন তা নিঃসন্দেহে স্বাধীন ভারতের সংসদীয় রাজনীতির ইতিহাসে অভূতপূর্ব ঘটনা। দেশের অন্য কোনও রাজ্যের একজন মুখ্যমন্ত্রীও এমন দাপটের সঙ্গে প্রতিশ্রুতি ও প্রকল্পের বন্যা বইয়ে দিতে পারেননি।

মমতার সাহসের সত্যি জবাব নেই। রাজ্যের কোষাগার শূন্য। ভাঁড়ে মা ভবানী। সরকারি কর্মীদের মাসিক বেতন দেওয়াই যেখানে সমস্যা, সেখানে তৃণমূলী মুখ্যমন্ত্রী প্রতিদিন শত শত কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পের ঘোষণা করে চলেছেন। এইসব প্রকল্প রূপায়ণের টাকা আসবে কোথা থেকে কেউ জানে না। এতকাল মমতা মা-মাটি-মানুষকে বুঝিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নে কেন্দ্র বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ দেবে। এখন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে পশ্চিমবঙ্গের জন্য আলাদাভাবে কোনও বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ দেশের সাংবিধানিক কাঠামো অনুসারে দেওয়া সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে 'বৈষম্য' হবে। কথাটা আমাদের পছন্দ না হলেও বাস্তব। কোনও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী চাইলেই কেন্দ্রীয় তহবিল খুলে দেওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে বেশ কিছু আইনি বিধি-নিষেধ আছে। সহজ করে বলতে গেলে বলতে হয়, কেন্দ্র আদতে সুদের কারবারী মহাজন। কেন্দ্র রাজ্যকে ঋণ দেয়। সুদের বিনিময়ে। একজন সুদের কারবারী যেমন ঋণ দেওয়ার আগে যাচাই করে নেয় খাতকের সুদ সহ ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা আছে কী না। তেমনি কেন্দ্র জানতে চাইবে খাতক রাজ্যটির রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থাটা কী রকম। অর্থাৎ, টাকাটা ফেরৎ পাওয়া যাবে কী না। এর জন্যই কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার পূর্ণাঙ্গ বাজেট প্রস্তাব বিধানসভায় পেশ করুন। আয় ও ব্যয়ের হিসাবটি বাজেটে দেখা যাবে। তারই ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় অর্থ সাহায্য পাওয়া যাবে। প্রণববাবুর কথাটা তেতো লাগলেও সত্য। 'মা-মাটি-মানুষের জয়' শ্লোগান দিলেই কেন্দ্রের আর্থিক সহায়তা পাওয়া যায় না।

মমতার স্থির বিশ্বাস ছিল যে কেন্দ্রের কংগ্রেস নেতৃত্ব তাঁর সরকারকে আর্থিক সঙ্কট থেকে উদ্ধার করবে। প্রণববাবু তাঁকে স্বপ্নের জগৎ থেকে এক ধাক্কায় বাস্তবের রূঢ় মাটিতে এখন দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন।

মমতার যে কেন্দ্রের এই সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতাটা বোঝেন না তেমন নয়। কিন্তু তিনি নিরুপায়। সিপিএম তাঁকে এই ফাঁদে ফেলবে বলেই গোপনে রাজকোষ শূন্য করে রেখে গেছে। কমিউনিস্টদের অতি প্রিয় 'পোড়া মাটি নীতি'। শত্রুকে হাতে নয়, ভাতে মারো। এই কঠিন পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে গেলে কেন্দ্রীয় অর্থ সাহায্য ছাড়া অন্য দ্বিতীয় পথ নেই। মমতার স্থির বিশ্বাস ছিল যে কেন্দ্রের কংগ্রেস নেতৃত্ব তাঁর সরকারকে আর্থিক সঙ্কট থেকে উদ্ধার করবে। প্রণববাবু তাঁকে স্বপ্নের জগৎ থেকে এক ধাক্কায় বাস্তবের রূঢ় মাটিতে এখন দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। প্রশ্ন উঠেছে, মমতার মা, মাটি, মানুষের সরকার বিধানসভায় পূর্ণাঙ্গ বাজেট প্রস্তাব পেশ করতে চাইছে না কেন? তাঁর অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্রও জানেন ভোট অন অ্যাকাউন্ট' বাজেট প্রস্তাবে রাজস্ব আদায়ের জন্য কর প্রস্তাব রাখা যায় না। সেই আর্থিক বছরের আয় ও ব্যয়ের খতিয়ান থাকে না। যা থাকে, তা হলো দুই বা তিন মাসের জন্য সরকারি খরচ চালাবার অধিকার। এই জাতীয় বাজেটকে সামনে রেখে কেন্দ্রীয় অর্থ সাহায্য পাওয়া যায় না। সব কিছু জেনেও মমতা পূর্ণাঙ্গ বাজেট প্রস্তাবের বদলে দ্বিতীয়বারের জন্য 'ভোট অন অ্যাকাউন্ট' বাজেট রাজ্য বিধানসভায় পেশ করতে চলেছেন কেন— এই রহস্যের সমাধান করবে কে? সিপিএম নেতারা বলছেন যে পূর্ণাঙ্গ বাজেটে কর প্রস্তাব থাকে। জনগণের উপর করের বোঝা চাপাতে নারাজ মুখ্যমন্ত্রী। তাই পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করছেন না। সিপিএম বলতে চাইছে, রেলমন্ত্রী থাকাকালে মমতা যাত্রীভাড়া ও পণ্য পরিবহণ মাশুল বৃদ্ধি না করে জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন। রেলমন্ত্রী থেকে এবার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর সেই চেনা পথেই হাঁটতে চাইছেন তিনি। জনগণের উপর করভার না চাপিয়েও উন্নয়নের চাকা সচল রাখা যায় এমন 'ম্যাজিক অর্থনীতি' মমতা দেখাতে চাইছেন। হ্যাঁ, যদি বাস্তবে এমন ম্যাজিক তিনি দেখাতে পারেন তবে নিঃসন্দেহে মমতাকে বিশ্ব অর্থনীতির 'এক নম্বর' দিশারী বলে চিহ্নিত করতে কেউই দ্বিধা করবে না। হয়তো আগামী বছরে নয়া অর্থনীতির জননী বলে তিনি নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হতে পারেন। শুধু হতভাগ্য মধ্যবিত্ত বাঙালি বলেই এই কলমচির সেই অতি পুরাতন কথাটা মনে আসে। বাঘের পিঠে হয়তো সওয়ার হওয়া যায়। কিন্তু বাঘের পিঠ থেকে নামা যায় না।

‘মার কা বদলা মার’ নীতি কি ফিরে আসছে?

নিশাকর সোম

এরাজ্যে রাজনৈতিক সংঘর্ষ-এর স্ফুরণ দেখা যাচ্ছে এবং সেটা ধীরে ধীরে ছড়াচ্ছেও। সিপিএম-এর রাজ্য-কমিটির সম্পাদক বিমান বসু (যাঁকে পার্টির নিচের তলার কর্মীরা বলে থাকে ‘ব্যর্থ বসু’) সম্প্রতি এক বক্তব্যে বলেছেন যে ‘তৃণমূল সন্ত্রাস চালাচ্ছে, এর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।’ তৃণমূলের নিচের তলার কর্মীদের একাংশ দীর্ঘ তিন দশকের ‘শোধ তোলার’ ক্রোধে ফুটছে! যে কোনও মুহূর্তে বিরাট সংঘর্ষ সৃষ্টি হতে পারে। এর প্রমাণ তো রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়েই দেখা গেছে।

সিপিএম বিভিন্ন জেলায় বর্ধিত জেলা কমিটির সভা করে এই প্রতিরোধী কর্মসূচীর কথা তুলে ধরছে। যদিও এইসব সভায় মূলত বিধানসভার নির্বাচনী বিপর্যয় সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটি এবং রাজ্য-কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ ব্যাখ্যা করাটাই মুখ্য ছিল। এই সব সভায় এ রাজ্যের সিপিএম-নেতৃত্ব কৌশলে বক্তব্য পেশ করে বলছে, ‘কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ভুলনীতির ফলে রাজ্যে তৃণমূল- কংগ্রেস জোট হওয়াতেই এই পরাজয়!’ এর দ্বারাই প্রমাণ হচ্ছে যে সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার চালিয়েও জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সমর্থন সংগ্রহ করতে তারা ব্যর্থ হয়েছে। এ সম্পর্কে সিপিএমের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এবং সিপিআই-সহ বামফ্রন্টের সকল শরিকদলের নেতৃত্বের বিশ্লেষণ হলো— সিপিএম পরিচালিত বামফ্রন্ট সরকার— শ্রমিক-কৃষকের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে ধনিক- বণিক তোষণে মত্ত হয়েছিল। যে টাটা-বিড়লাদের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট তথা বামপন্থীরা স্লোগান দিত— সেই টাটাকে তোষণ-পোষণ করার নীতি গ্রহণ করেছিল বুদ্ধ-নিরুপম-গৌতম-বিমান। গৌতম দেব তো আবাসন মন্ত্রীর অভিধা পরিত্যাগ করে ‘প্রোমোটার-বান্ধবমন্ত্রী’ হিসাবে নিজেকে প্রকট করে তুলেছিলেন। এই গৌতম দেব-এর ‘বুকনিবাজি’র ফলেই ফ্রন্টের পরাজয় গভীর থেকে গভীরতর হয়েছিল। এই বুকনিবাজ নেতার চেষ্টা ছিল পার্টির নিচের তলার কর্মীদের মারমুখী রাজনীতিকে উজ্জীবিত করা। এর ফলে পরাজয়ের গ্লানিতে সমগ্র সিপিএমের সংগঠন ধসে গেছে। তবুও সিপিএম-নেতারা ‘মার কা বদলা’ নীতিকেই উস্কে দিচ্ছেন।

সিপিএম মারদাঙ্গাবাজ নেতা সুশান্ত ঘোষ জামিন নিয়ে আনন্দে আছে! রাজ্য-সরকার তাকে আনন্দে থাকতে দেবে কি? খবরে প্রকাশ সুশান্তবাবুর দু’জন ঘনিষ্ঠ পুলিশের কাছে নাকি ‘স্বীকারোক্তি’ দিয়েছে। এখানে বলা দরকার, দীপক সরকার-সুশান্ত ঘোষ গোষ্ঠী বলছে যে তাঁদের নীতির ফসল হিসাবেই পার্টি পশ্চিম মেদিনীপুরে পা-রাখতে সক্ষম হয়েছে। এদিকে সংবাদে প্রকাশ, হলদিয়ার নিন্দিত নেতা লক্ষ্মণ শেঠ মমতার সান্নিধ্য খুঁজে বেড়াচ্ছেন। এটাই স্বাভাবিক কেননা এরা তো ক্ষমতা-লোভী। এখন সিপিএম-এ দীপক- সুশান্ত গোষ্ঠী, গৌতম গোষ্ঠী, বুদ্ধ-বিমান গোষ্ঠী আর বর্ধমান গোষ্ঠী— এদের মধ্যে ক্ষমতা দখলের লড়াই চলেছে। তবে বুদ্ধ-বিমান-নিরুপমদের বিরুদ্ধে সিপিএমের নিচের তলার সংখ্যাগরিষ্ঠ কর্মীরা মত প্রকাশ করেছেন। সম্প্রতি বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে দিয়ে সিপিএমের কলকাতা জেলা কমিটি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বক্তব্য পেশ করিয়েছে। বুদ্ধবাবুর বক্তৃতাটাকে ‘মেঠো’ বক্তৃতা বলা যায়— না-ছিল তাতে গভীরতা বা

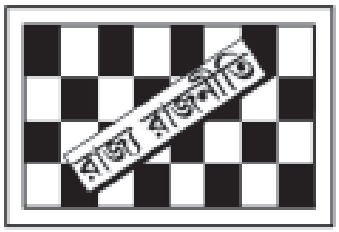

রবীন্দ্রনাথের দর্শনের ধারে কাছে যায় কোনও ব্যাখ্যা। যাঁরা সত্যিকারের রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে চান তাঁদের বিনীতভাবে রবীন্দ্রনাটক-গীতিনাট্য-কাব্যনাট্য পড়তে অনুরোধ জানাচ্ছি। বিশেষ করে ‘অচলায়তন’ ‘চণ্ডালিকা’ ‘কালের যাত্রা’ এবং ‘ঐকতান’ কবিতাটা পড়তে অনুরোধ করছি।

সিপিএম কর্মীরা লিউ সাউ-চি-এর পুস্তক এবং চীনের কমিউনিস্ট প্রচারিত ‘মেকি কমিউনিজম’ পুস্তকগুলির নাম জানেন কি?

এ রাজ্যে সিপিএম পার্টি তো একটা লুম্পেনদের পার্টিতে পরিণত হয়েছে। এই কারণেই তারা ‘হার্মাদ’ হিসাবেই অভিহিত।

সিপিএমের রাজ্য-কমিটির প্লেনাম হবে। এই প্লেনাম থেকেই ‘প্রতিরোধী’ নীতির প্রসার হবে! কিন্তু সেখানে বর্তমান রাজ্য-নেতৃত্ব হবেন নিন্দিত। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার জমি অধিগ্রহণ করতে গেলেই এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে চাষীদের প্রতিরোধ তৃণমূলী-মাওবাদী কায়দায় করা হবে।

এদিকে তৃণমূল-কংগ্রেস জোটের মধ্যেও দর কষাকষির চোরা স্রোত প্রবল। কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত কংগ্রেসের কাউকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারে যাওয়ার জন্য কংগ্রেসের অনুমোদন নিতে হবে। সুখেন্দুশেখরের তৃণমূলে যাওয়া এবং রাজ্যসভার সদস্য হওয়ার ঘটনায় কংগ্রেসী-নেতৃত্ব ভীত সন্ত্রস্ত। তৃণমূলের লক্ষ্য এ রাজ্যে কংগ্রেসকে ভেঙে দেওয়া। কংগ্রেসিদের মধ্যে ক্ষমতা-লোভীদের টানতে চাইছেন মমতা ব্যানার্জি। তিনি তো কংগ্রেসেরই লোক ছিলেন।

এদিকে হিডকোর চেয়ারম্যান করা হয়েছে দেবাশিস সেন-কে। তিনি আবার হিডকোর ম্যানেজিং ডিরেক্টর। এতদিন প্রথা ছিল রাজ্যের আবাসনমন্ত্রী হিডকোর-চেয়ারম্যান হবে। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের আবাসনমন্ত্রীকে এই পদে বসালেন না? হিডকোর আগের ম্যানেজিং ডিরেক্টর-কে জনস্বাস্থ্য কারিগরি (পি এইচ ই)-এর সচিব করা হলো। তিনি মন্ত্রী সুব্রত মুখার্জির অধীনে কাজ করবেন। এছাড়া সিঙ্গুরের তৃণমূল বিধায়ক-মন্ত্রী রবীন ভট্টাচার্য-কে নিয়ে সিঙ্গুরের তৃণমূলের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে। রবীনবাবু-কে শিক্ষামন্ত্রী পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে কৃষিমন্ত্রী করা হলো। এখন দেখা যাচ্ছে রবীনবাবুকে কৃষিদপ্তরের কাজেও হাত দিতে দেওয়া হচ্ছে না। তাঁকে কোণঠাসা করা হচ্ছে। সিঙ্গুরের তৃণমূলীদের বক্তব্য— ‘রবীনবাবু সৎ সাদাসিধে মানুষ। স্পষ্ট কথা বলতে অভ্যস্ত। কাজেই রবীনবাবুকে কোণঠাসা করা হলে সিঙ্গুরে বিদ্রোহ হবে।’

ইতিমধ্যে তৃণমূলের সাংসদ প্রাক্তন রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্র মুকুল রায়ের বিরুদ্ধে পত্রাঘাত করেছেন। এটি কলকাতার একটি প্রথমশ্রেণীর তৃণমূল সমর্থক কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। এই ঘটনাই দেখাচ্ছে যে তৃণমূলের কাজকর্মে সোমেন মিত্র খুশী নন। যেমন খুশী নন মুর্শিদাবাদের জেলা কংগ্রেস সভাপতি তথা সাংসদ অধীর চৌধুরী। এঁদের চাপেই প্রণব-পুত্র-কে গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে সরে যেতে বাধ্য করা হলো। ঘটনা এখানেই থামবে না। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর কাজকর্মে নীতি নিয়ে তৃণমূলের জয়ের অন্যতম স্থপতি সুনন্দ সান্যাল বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। ‘বঙ্গবিভূষণ’ পুরস্কার দেওয়া নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। কেন সাবিত্রী চ্যাটার্জি-কে বাদ দেওয়া হলো? বামপন্থী সমর্থক বহু অভিনেতা-পরিচালক-নাট্যকর্মী কি বাদ গেলেন রাজনৈতিক কারণে? আবার বুদ্ধবাবুর ‘আমরা-ওরা’ নীতির পুনরুত্থান ঘটছে কি? এর ফলেই বাদ হলেন কি যাদু সম্রাট, যাত্রাসম্রাট এবং মাইম সম্রাট?

জেলা ভাগ

কলকাতা যে এরাজ্যের একটা জেলা তা খাতায়-কলমে থাকলেও কার্যত তার যেন কোনও অস্তিত্বই নেই। কেননা অন্যান্য জেলার মতো কলকাতায় কোনও জেলাশাসকও নেই, মহকুমা শাসকও নেই। ইদানীং কলকাতাতেও অন্যান্য জেলার মতো প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ার ভাবনা-চিন্তা শুরু হয়েছে। শুধু তাই নয়, সুষ্ঠু প্রশাসনের লক্ষ্যে মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, বর্ধমান, জলপাইগুড়ি জেলাকে ভেঙে নতুন কয়েকটি জেলা গঠনে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রদপ্তর উদ্যোগ নিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে এই ২০১১ সালের হিসাব অনুযায়ী বাস করেন ১০২৯। পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যা ৯ কোটিরও বেশি। বিহারে যেখানে জেলার সংখ্যা ৩৭, ঝাড়খণ্ডে ২০, ওড়িশায় ২৯, অসমে ২২ এবং অন্ধ্রে ২৩, সেখানে পশ্চিমবঙ্গের ২৪। তাই প্রশাসনিক সংস্কারের জন্য এরাজ্য জেলা ভাগ জরুরী হয়ে উঠেছে। উল্লেখ্য, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ তার সাংগঠনিক কাজের স্বার্থে ইতিমধ্যেই এই বড় জেলাগুলিকে বিভিন্ন ছোট ছোট জেলায় ভাগ করেছে।

এই সময়

ফুলের ঘায়ে

ফুলের ঘায়ে রীতিমতো মূর্ছা যাওয়ার অবস্থা। তথ্য জানার অধিকার সূত্রে জানা গিয়েছে কম্প্রটোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (ক্যাগ)-এর অফিসে ২০০৮ থেকে ২০১০ পর্যন্ত তিন বছরে ফুলের বোকে এবং ফুল কেনার জন্য খরচ হয়েছে মাত্র ১৮.৬৬ লক্ষ টাকা। ক্যাগের তিনটি কার্যালয় অর্থাৎ মূল দপ্তর ও সংলগ্ন দপ্তরটি (ঠিকানা ১০ বাহাদুর শাহ জাফর মার্গ)-তে এবং ৯, দীনদয়াল উপাধ্যায় মার্গের ক্যাগ কার্যলয়ে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এবং কার্যালয়গুলো সাজাতে ফুলের জন্য উপরোক্ত খরচ পড়েছে। এরপরেও মূর্ছা না গিয়ে উপায় আছে, বলুন? অন্তত এই মাগ্গীগণ্ডার বাজারে!

আল কায়েদা-র নজরে

লাদেনে-র মৃত্যু যে আল-কায়েদাকে কতটা মরিয়া করে দিয়েছে তার প্রমাণ অতি সম্প্রতি ত্রিশূরে গুরুবায়ুর কৃষ্ণমন্দিরে পাঠানো একটি চিঠি। আল কায়দা'র নামে পাঠানো সেই চিঠিতে দাবি করা হয়েছে, ওই মন্দির সমেত অন্যান্য মন্দিরে অতি শীঘ্রই বোমা বিস্ফোরণ করা হবে। শুধু তাই নয়, গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতার মৃত্যু পরোয়ানার কথাও উল্লিখিত হয়েছে সেই চিঠিতে। চিঠিটি সত্যিই আল কায়দা-র পাঠানো কিনা তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে বিপদের আশঙ্কা উড়িয়ে দিতে পারছেন না কেউই।

চিদাম্বরমকে সমনের দাবি

বর্তমান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরমকে সমন দেওয়ার দাবি জানাল বিজেপি। যৌথ সংসদীয় কমিটি'র সদস্য বিজেপি নেতা যশবন্ত সিনহা-র বক্তব্য, টু-জি স্পেকট্রাম নিয়ে আর্থিক দুর্নীতি-র সময় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ছিলেন পি চিদাম্বরম। সেইদিক দিয়ে তিনিও মামলার একজন সাক্ষী। সুতরাং তাঁকেও সমন দিতে হবে। যশবন্ত সিনহার দাবির যৌক্তিকতা অস্বীকার করতে পারছে না কংগ্রেসও।

জমি অধিগ্রহণে 'অনিচ্ছুক' জট

জমি অধিগ্রহণ জট অব্যাহত। বিশেষত দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকারের এনিয়ে মাথা-ব্যাথার মূল কারণ তাদের দ্বিতীয় বৃহত্তম শরিক দল অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেস। যে জমি আন্দোলন তাদের রাইটার্সের পথ সুগম করে দিয়েছে, সেই আন্দোলনের বিপরীত অভিমুখী কেন্দ্রীয় জমি অধিগ্রহণ বিলকে কি করেই বা সমর্থন করবেন মমতা? জমি অধিগ্রহণের সঙ্গে পুনবার্সন শব্দটা ঢুকিয়েও ছোট শরিকের মন ভেজাতে ব্যর্থ বড় শরিক। এবার বড় শরিকের সর্বশেষ মরিয়া প্রচেষ্টা—বিলে যুক্ত হচ্ছে যে ব্যক্তিগত কারণে জমি কিনতে হলে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন কোম্পানীগুলিকে জমির মালিকদের মধ্যে ন্যূনতম ৮০ শতাংশের লিখিত অনুমতি নিতে হবে। কিন্তু এতে জট আরও বাড়ছে বই কমছে না। কারণ সিঙ্গুর উত্তর পর্বে বিখ্যাত হয়ে যাওয়া সেই শব্দবন্ধনী 'অনিচ্ছুক'দের (বাকি ২০ শতাংশ) তবে কি হবে? আর জমির ওপর নির্ভরশীলদের শুধু প্রস্তাবিত 'পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণে'ই কি ক্ষান্ত থাকবেন মমতা? তাদের মতামতটাকেও প্রাধান্য দেওয়ার ফ্যাকড়া তুলে আবার না বিলটি-কে আটকে দেন। এমনই আশঙ্কায় দিন গুনছেন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী জয়রাম রমেশ।

কালোত্তীর্ণ

ভাবা যায়! খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্টের পত্নী মিশেল ওবামা কিংবা রিপাবলিকান নেত্রী সারা প্যালীনের সঙ্গে একাসনে কি না ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ। এটুকু পড়ে নাক কুঁচকোবেন না। বলে বসবেন না কার সঙ্গে কার তুলনা, লক্ষ্মীবাঈ ওদের তুলনায় সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। সবটা তো আগে শুনুন। সম্প্রতি নিউইয়র্কের 'টাইমস' ম্যাগাজিনে যে ১০ জন 'ডাকাবুকো পত্নী' (ডেয়ার ডেভিলস ওয়াইভস)-কে বেছে নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে লক্ষ্মীবাঈ সহ মিশেল, সারা-রা রয়েছেন। বুঝতেই পারছেন, ইদানীন্তন নারী-মুক্তি আন্দোলনের ঢক্কা নিনাদের যুগেও টাইমস ম্যাগ উনিশ শতকের মধ্যভাগে মহাবিদ্রহে-র নেত্রী ঝাঁসির রাণীকে অগ্রাহ্য করতে পারেনি একেবারেই। ইতিহসবিদেরা তাই মেনে নিচ্ছেন যে আক্ষরিক অর্থেই তিনি কালোত্তীর্ণ। প্রসঙ্গত, তালিকায় স্থান পেয়েছিল প্রাচীনা মিশর-নারী ক্লিওপেট্রাও।

বাম-জমানায় ধ্বংসপ্রাপ্ত শিক্ষার সংস্কার হওয়া প্রয়োজন

দেবীপ্রসাদ রায়

বিগত ৩৪ বছরে অনেককিছুই হারিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ যাদের মধ্যে একটি প্রধান হলো তার শিক্ষাব্যবস্থার গৌরবোজ্জ্বল প্রাপ্তিগুলি। এগুলির পুনরুদ্ধারই নতুন প্রশাসনের প্রথম এবং প্রধান কাজ। দুরূহ অথচ অবশ্য করণীয় এই কাজে সফল হওয়ার জন্য সুচিন্তিত পরামর্শ বিশেষ প্রয়োজন যেগুলির বিশ্লেষণজাত সিদ্ধান্ত ওই পুনরুদ্ধারকে ত্বরান্বিত করবে। এইসব পরামর্শ আহ্বান করে সংবাদপত্র এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে সন্দেহ নেই। প্রশাসককেও এই 'পরামর্শ' সম্পর্কে আগ্রহী হতে হবে মুক্তমনে, কারণ নবাগত মন্ত্রীদের চোখের সামনেই শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটছে, যেগুলি তাদের নাড়া দেয়নি।

বিগত ৩৪ বছর ধরে যে আবর্জনা স্তূপে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাসংস্কৃতি, মূল্যবোধ এবং সর্বোপরি জাতীয়তাবোধ চাপা পড়ে গিয়েছিল তাকে সরিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে স্বমহিমায় দাঁড় করানো এক ভীষণ কঠিন কাজ। আমাদের জীবদ্দশায় কোনওদিন যে এই কমিউনিস্ট রাহুমুক্তি ঘটবে তা কল্পনাও করতে পারিনি, পারেনি কেউই। ১৯৯১ সালের আগস্ট মাসে সোভিয়েট রাশিয়ায় যে গণঅভ্যুত্থান কমিউনিস্ট শাসনের অবসান ঘটিয়ে নভেম্বর বিপ্লব'কে ম্লান করে দিয়ে ইতিহাস রচনা করেছিল, ২০১১-র মে মাসে কমিউনিস্ট শাসিত পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট শাসনের অবসান তার চাইতে কোনও অংশে কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। এই প্রায় অসম্ভবকে সম্ভব করেছিল মমতা ব্যানার্জীর অতুলনীয় নেতৃত্ব— বিশ্বের ইতিহাসে ধন্যবাদার্হ। বিগত ৩৪ বছরে অনেককিছুই হারিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ যাদের মধ্যে একটি প্রধান হলো তার শিক্ষাব্যবস্থার গৌরবোজ্জ্বল প্রাপ্তিগুলি। এগুলির পুনরুদ্ধারই নতুন প্রশাসনের প্রথম এবং প্রধান কাজ। দুরূহ অথচ অবশ্য করণীয় এই কাজে সফল হওয়ার জন্য সুচিন্তিত পরামর্শ বিশেষ প্রয়োজন যেগুলির বিশ্লেষণজাত সিদ্ধান্ত ওই পুনরুদ্ধারকে ত্বরান্বিত করবে। এই সব পরামর্শ আহ্বান করে সংবাদপত্র এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে সন্দেহ নেই। প্রশাসককেও এই 'পরামর্শ' সম্পর্কে আগ্রহী হতে হবে মুক্তমনে কারণ নবাগত মন্ত্রীদের চোখের সামনেই শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটছে যেগুলি তাদের নাড়া দেয়নি। যেমন পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার (পশ্চিমবঙ্গ সরকার নয়) প্রকাশিত সাহিত্য প্রয়াস আলোর ফুলকি যেখানে কমরেড লেনিনকে শিশুদের কাছে আদর্শরূপে তুলে ধরা হয়েছে— নেতাজী বা বিবেকানন্দকে নয়। প্রাথমিক পাঠক্রম থেকে বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথকে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে। মাতৃভাষা-মাতৃদুগ্ধ-স্লোগানের আড়ালে দেশব্যাপী ইংরাজী শিক্ষার বাঙালী খ্যাতির মেরুদণ্ডকে ভেঙ্গে দেওয়া হলো প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরাজী হটিয়ে এবং অন্যদিকে উপযুক্তভাবে বাংলা শেখানোও হলো না, সাহিত্য বোধও জন্মালো না—মাধ্যমিকের 'পাঠসংকলনে' মুজফ্‌ফর আহমেদের মেঠো বক্তৃতা ঢুকিয়ে দেওয়ার কথা মনে আছে নিশ্চয়ই? এই পরিস্থিতিতে বেড়ে ওঠা ছাত্রছাত্রীরা যখন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে এল দেখা গেল তারা সাবলীল ভাবে বাংলাও পড়তে পাচ্ছে না, পারছে না ইংরাজীতে একটা আবেদনপত্র লিখতে। ইতিমধ্যে বামপন্থীর সংস্কৃতির ট্রামবাস পোড়ানোর আন্দোলন, স্কুলকলেজ ভাঙচুরের আন্দোলন বামফ্রন্টীয় শাসনকালে চরম উৎকর্ষতায় পৌঁছে যায় তার প্রমাণ বাঁকুড়ার অধ্যক্ষ অমিয় কিস্কুর লাঞ্ছনা বামছাত্র অধ্যাপকের যৌথ প্রয়াসে, অধ্যক্ষ সাধন সরকারের মৃত্যু, উপাচার্য সন্তোষ ভট্টাচার্যের বামপন্থীর অসভ্যতা-উন্মত্ততার শিকার হওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। আজকে মন্ত্রিত্ব পাওয়া অনেকেই তখন নির্বিকারচিত্ত থেকেছিলেন—সেজন্যই এইসব অতীতস্মারক সম্বলিত পরামর্শ প্রয়োজন। এইসব বামপন্থীয় বৈপ্লবিক 'প্রাকটিস'-এ শিশু কিশোর যুব-মানসে এক বিপর্যয় ঘটতে থাকে যার পরিণতিতে আজ এক স্কুলছাত্র তার বন্ধুকে অবলীলাক্রমে খুন করে দেয়, কলেজে এক ছাত্র আর একজনকে নৃশংস ভাবে মেরে ফেলতে পারে—এক অসুস্থ বিকৃত মানসিকতা গ্রাস করে যুবচিত্তকে— যা ভাবলে বিনিদ্র রজনী কাটাতে হয় মা বাবা অভিভাবকদেরকে দিনের পর দিন। আমাদের সময়ে শৈশব-কৈশোর আচ্ছাদিত ছিল সহজসরল একদা বহুপঠিত একটি কবিতার দর্শনে 'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি, সারাদিন আমি যেন ভাল হয়ে চলি...'। বামপন্থী বৈপ্লবিক সাংস্কৃতিক কর্মপ্রয়াসে সেই দর্শনের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটেছে কবেই! তা থেকে বিচ্যুতিই বাঙালীর আজকের অধঃপতনের কারণ। আমরা সেই পরিবেশ ফেরত চাই। তার জন্য দরকার—

(১) প্রাথমিক শিক্ষায় বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথকে ফিরিয়ে আনতে হবে। পাস-ফেল প্রথা কোন স্তর থেকেই তোলা হবে না। কারণ কোনও ইতিবাচক লক্ষ্য এতে পূরণ হয়নি।

(২) চাকরী এবং উচ্চতর গবেষণার ক্ষেত্রের জন্য ইংরাজীকে গুরুত্ব দিতে হবে, কথ্য ইংরাজীতে সাবলীল না হওয়ার জন্য অনেকক্ষেত্রেই অসুবিধায় পড়তে হয়। যা করা উচিত তা হলো পুরানো ইংরাজী শিক্ষণ পদ্ধতির সঙ্গে স্পোকেন পারদর্শী শিক্ষক নিয়োগ আবশ্যিক করা। আমাদের সময়ে বহুস্কুলে ইংরাজী কথাবর্তা ইংরাজীতে আবশ্যিক ছিল শিক্ষকের উদ্যোগে, তার সুফল অনেকে এ ব্যবস্থা ব্যাপক ও সার্বিক করতে হবে, স্কুলে স্কুলে থাকা ইংরাজীর শিক্ষকদের

এই পারদর্শিতা অর্জনের জন্য ট্রেনিং নিতেই হবে এবং সেই মতো ক্লাশ করতে হবে—ছাত্রছাত্রীদেরও System English-এ পারদর্শিতার পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। অভ্যন্তরীণ ভাবে এই ব্যবস্থা নিলে পাগলের মতো ইংরাজী মাধ্যম স্কুলে যাওয়া বন্ধ হবে। অভিভাবকরাও এক ব্যয়বহুল ব্যবস্থা থেকে রক্ষা পাবে।

(৩) এতদিন সি পি আই (এম) দলীয় উদ্দেশ্য সাধনের অনুকূলে পাঠ্যসূচী ও পাঠক্রম তৈরী করেছিল যাতে জাতীয়তাবোধ ও ভারতীয়তাবোধ থেকে ছাত্রছাত্রীরা দূরে সরে যায়। সেইমতো ইতিহাসের পাঠক্রম তৈরি করেছিল। সত্য থেকে দূর এবং বিকৃত ইতিহাস পড়তে হোত। এই বিকৃত ইতিহাসের পরিবর্তে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জন্মানোর লক্ষ্যে প্রকৃত ইতিহাস পড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। নিজদেশের ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ রেখে বাইরের দেশের ইতিহাসের অনেক অপ্রয়োজনীয় অংশের ভারে ভারাক্রান্ত করা হয়েছিল। স্কুলের উচ্চপর্যায় থেকে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তর অর্থাৎ ভারতের কৃষ্টি ধর্ম দর্শন সম্পর্কে ছাত্রছাত্রী তথা সাধারণ মানুষকে অবহিত ও সচেতন করার জন্য 'ভারততত্ত্ব'— এক নতুন পাঠক্রম চালু করা দরকার, জাতীয়তাবোধ ও জাতীয়তাবাদ ক্ষীণ হয়ে আসার জন্যই ভারতের প্রার্থিত উন্নতি ব্যাহত হচ্ছে। আন্তরিকতার সঙ্গে এগুলি জনমানসে পুষ্ট করতে হবে এবং এজন্য চাই সংস্কৃতভাষার ব্যাপক চর্চা। জাতীয় শিক্ষা নীতিতেই এর স্বীকৃতি থাকলেও এরাজ্যে সংস্কৃত পঠন পাঠন চর্চা ও গবেষণা ভীষণ ভাবে অবহেলিত। জাতীয়তাবাদ ফ্যাসিবাদে উত্তীর্ণ হয়— এটি কমিউনিস্টদের অপপ্রচার। ভারতীয় দর্শন আধারিত ভারতীয় জাতীয়তাবাদ কখনওই ফ্যাসিবাদ অভিমুখী ছিল না, নেই এবং হতে পারে না। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, নেতাজী প্রমুখ আন্তর্জাতিক মনীষীর উদ্ভবই তার প্রমাণ।

(৪) দারিদ্র্য কবলিত মানুষের জন্য খাদ্যবস্তুর ব্যবস্থা সরকার করছে ও করবে— ঘোষণা হয়েছে, কিন্তু 'স্কুলে মিড ডে-মিল' ব্যবস্থা যে হৈ-হট্টগোল দুর্নীতি ও সংঘর্ষের পরিবেশ তৈরি করেছে ইতিমধ্যেই এবং পঠন-পাঠনকে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে তার বিচারে এই ব্যবস্থা অবিলম্বে তুলে দিতে হবে। মূলত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে ভোট প্রাপ্তির লক্ষ্যে এই ব্যবস্থা চালু হয়েছিল বলেই এর জন্য শিক্ষার প্রসার তো ঘটেইনি উপরন্তু অনিয়ম দুর্নীতি ও সংঘর্ষের প্রসার ঘটিয়েছে। অঞ্চল বিশেষে দরিদ্রদের জন্য বিভিন্ন বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে কিন্তু 'মিড ডে মিল' প্রকল্প বন্ধ করা একান্তই দরকার শিক্ষার স্বার্থে। এ নিয়ে দ্রুত ভাবনাচিন্তা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ জরুরী।

(৫) স্কুলে এস এস সি-র মাধ্যমে দল-অপছন্দ প্রার্থীরা যদি কোনওক্রমে চাকরী পেয়েও যায় তাদের জন্য দুর্গম স্থানে পোস্টিং করা এবং পরে দুর্গম স্থান থেকে সুগম স্থানে আসার জন্য বিপুল আর্থিক লেনদেন তথা সোনার খনি'র ব্যবস্থা চলে আসছে— চলে আসছে মাওবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নামে পার্টিফান্ডে অলিখিত বাধ্যতামূলক ডোনেশন-এর ব্যবস্থা— এসব বন্ধ করতে হবে। ভয়মুক্ত চিত্তে শিক্ষকতা করা নিশ্চিন্ত করতে হবে।

(৬) কলেজেও দল-অপছন্দ প্রার্থীদের এস এস সি-ইন্টারভিউ বিলম্বিত করা, ইন্টারভিউ তারিখের পরে ইন্টারভিউ চিঠি তাদের ঠিকানাতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা এবং তারও আগে থেকে অপছন্দ অথচ সম্ভাব্য প্রার্থীদের বিভিন্ন পর্যায়ে পরীক্ষার ফল নিয়ন্ত্রণ করার বৈজ্ঞানিক নিখুঁত ব্যবস্থাদি গড়ে তোলা হয়েছিল। তার ফলে ভালো রেজাল্ট করা, পি-এইচ ডি করা নামী ছাত্রছাত্রীরা অতৃপ্তি ও হতাশা নিয়ে অবাঞ্ছিত জায়গায় চাকরী করছে— এদের ফেরানো উপযুক্ত জায়গায়। সরকারকে সে সুযোগ দিতে হবে তাদের। অনেকে হতাশ হয়ে পি. ডি. এফ নিয়ে বাইরে চলে গেছে এবং থাকতে বাধ্য হচ্ছে সেখানে। এতসব কৃতি ছাত্রছাত্রীরা এখানে শিক্ষা গবেষণা ক্ষেত্রে কিছু অবদান রাখতে পারত।

এস এস সি/সি এস সি—এগুলি বৈজ্ঞানিক ও ভালো ব্যবস্থা। কিন্তু সব ভালো ব্যবস্থাকে খারাপে পরিণত করার কমিউনিস্ট আদর্শ ও কৌশলই পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষাক্ষেত্রের দুরবস্থার জন্য দায়ী।

(৭) বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দলীয় রাজনীতির দাপাদাপিতে স্বমহিমাচ্যুত হয়েছে অনেকদিন। শিক্ষার যে ব্যাপক ধারণা, যে বিস্তৃত সংকীর্ণতামুক্ত ধারণা নিয়ে বিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয় তা একেবারে সর্বাংশে ভুলুণ্ঠিত হয়েছে বিগত তিন দশকে। ছাত্রছাত্রী জনসাধারণ দেশবাসী দেখছে উপাচার্য জালিয়াতি দোষে অভিযুক্ত এবং তিনি সরকার দ্বারা প্রশ্রয়িত হচ্ছেন। ভাবা যায়?

যথোপযুক্ত উদ্যোগে, অভিভাবকত্বে এবং প্রহরায় শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ, গবেষণার উপযুক্ত আবহাওয়া এবং মূল্যায়নের সঠিক দিশা স্থির করতে হবে সরকারকে। রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর অন্তত আগের মতো হোক সব কিছু এই স্বপ্ন দেখছি আমরা অবসর-প্রাপ্তরা, আরও ভালো আশা করার আগে।

(লেখক বাঁকুড়া কলেজের পদার্থবিদ্যা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক)

নগদ অর্থ দিয়ে ভর্তুকি মেটানো কি আরও ভালো বিকল্প ?

অতিথি কলম

ডঃ ভরত ঝুনঝুনওয়ালা

কেন্দ্র সরকার খাদ্য সার এবং অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের উপর থেকে ভর্তুকি তুলে দিতে চাইছে। ভর্তুকি দেওয়া থেকে সরকার সরে আসতে চাইছে। কারণ সরকার মনে করছে যে ভোগপণ্যের পরিবর্তে অর্থই দেওয়া হোক। এটা সঠিক পদক্ষেপ বলেই মনে হয়। তত্ত্বগতভাবে এই ভর্তুকির ফলে গরীবরাই উপকৃত হয়ে থাকে। কিন্তু কার্যত অবস্থাপন্নরাই এই সুবিধা পেয়ে থাকে। কিন্তু দেশের ঐতিহ্য অনুযায়ী দরিদ্রদের জন্য ভর্তুকি দেওয়ার ব্যবস্থা রীতি আছে।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বলা আছে রাজা ধনীদের থেকে কর সংগ্রহ করে গরীবদের মধ্যে বণ্টন করবে।

কিন্তু সরকারের এই পদক্ষেপ নানা বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। অনেকের মতে খাদ্য ও সারের ভতুর্কি যেমন গরিবের কাছে পৌঁছয় না, তেমনি নগদ টাকার ভর্তুকিও গরিবের কাছে পৌঁছবে না। অনেক রাজ্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলে এমপ্লয়ী গ্যারেন্টি স্কীম-এর (Employee Gurantee Scheme) মাধ্যমে নগদ টাকার মাধ্যমে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। তাতেও দেখা যাচ্ছে বেনামী অ্যাকাউন্টের বৃদ্ধি ঘটেছে। এটা বাস্তবিকই একটি সমস্যা। তবুও নিশ্চিত করেই বলা যায় যে বি পি এল (বিলো পভার্টি লাইন) কার্ডের মাধ্যমে ভর্তুকি দিতে গিয়ে যে দুর্নীতির মুখোমুখি হতে হচ্ছে, ব্যাঙ্কের মাধ্যমে নগদ অর্থ দিলে তা অনেক কমে যাবে।

বি পি এল কার্ড পরীক্ষা করাও ভীষণ জটিল ও কষ্টসাধ্য। পরীক্ষককে দরজায় দরজায় ঘুরতে হয় সঠিক তালিকা তৈরির জন্য। তবুও সঠিক তালিকা তৈরি হয় না। অন্যদিকে ব্যাঙ্কের রেকর্ড বুক থেকে অ্যাকাউন্ট হোল্ডারের পরিচয় পাওয়া যাবে। গরীব মানুষরা তাদের বি পি এল কার্ড দালালদের হাতে তুলে দেয় কেন না তাদের কাছে টাকা ও রেশন দোকানে গিয়ে জিনিষপত্র কেনার সময় নেই। তাই দালালদের উৎপাতে বেনিয়ম বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। সরকার প্রত্যেক নাগরিককে Unique Indentification Number (ইউ আই ডি) দিতে চলেছে। এই কার্ডগুলোতে হাতের ছাপ ও লোকের চোখের নিশানা (আইবলস) ফটোগ্রাফ থাকবে। এই ইউ এন আই কার্ড নগদ অর্থ দেওয়ার ক্ষেত্রে দুর্নীতির বাধা স্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে।

কেরোসিন ডিজেল সার ও খাদ্যের উপরই ভর্তুকি দেওয়া হয়। এই পরিধিকে আরও বিস্তৃত করা যাবে। ডাক্তার ও শিক্ষকদের বেতন দেওয়াও এক ভর্তুকি। তাই সমগ্র জনকল্যাণমূলক পরিষেবা ব্যবস্থা বাতিল করে সরাসরি নগদ অর্থে প্রদান করা হলে এক পরিচ্ছন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। মানুষ বাজার থেকে স্বাস্থ্য শিক্ষা পরিষেবা ক্রয় করতে পারবে।

বি পি এল কার্ডের প্রয়োজনীয়তা তেমন একটা নেই। অনেকে বি পি এল কার্ডের সুবিধা নেবার জন্য 'কম আয়ের দলে' থাকতে চায়। বি পি এল এবং এ পি এল (অ্যাভাব প্রভার্টি লাইন) ব্যবহার ছাড়াই ধনী দরিদ্র উভয়কে নগদ ভর্তুকি দেওয়া যেতে পারে। রতন টাটা ও কুমার মঙ্গলম বিড়লাও এই সুবিধা পেতে পারে। দরিদ্র জনসাধারণকে কেউ বি পি এল বলে অভিহিত করবে না অর্থাৎ অবজ্ঞার চোখে দেখবে না। নিজের জীবনযাত্রার মান কেউ কমাতে চাইবে না। নগদ ভর্তুকি মোট খরচ বাড়িয়ে দেবে ঠিকই, কিন্তু এই ব্যবস্থা দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ রোধ করবে। বি পি এল কার্ডের মাধ্যমে যে দুর্নীতি হয় তা রোধ করা সম্ভব হবে।

আমরা যদি বিচার বিশ্লেষণ করি তবে দেখতে পাবো যে আমাদের কাছে যে অর্থ আছে তা দিয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে নগদ ভর্তুকি দেওয়া যাবে। সামাজিক ও গোষ্ঠীগত কল্যাণে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার প্রায় ৪০৬ কোটি টাকা ব্যয় করে— এই হিসাব দিয়েছে বিত্ত মন্ত্রণালয়। শিক্ষা স্বাস্থ্য ও গৃহ নির্মাণে এই অর্থ ব্যবহৃত হয়। বাজার থেকে অর্থমূল্যে এইসব পরিষেবা সবাই পেতে পারে। মানুষকে ভোগ্যপণ্যে ভর্তুকি বদলে নগদ অর্থ দেওয়া হবে। সরকার শুধু গবেষণা ও নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে রাখবে। অন্যান্য ক্ষেত্র ধরে প্রায় ৩০০ হাজার কোটি নগদ টাকা জনগণের জন্য ব্যয় করা যেতে পারে। এছাড়া খাদ্য, সার, এল পি জি, ডিজেল, কেরোসিন ভর্তুকি দেওয়ার জন্য আরও ১৫০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা যেতে পারে। এমপ্লয়ী গ্যারেন্টি স্কীম অনুসারে। ইতিমধ্যেই ৫০০ হাজার কোটি টাকা পাওয়া যেতে পারে।

মোট ২০ কোটি পরিবারকে বার্ষিক ২৪০০০ টাকা করে দেওয়া যাবে। ধনী সহ প্রত্যেক গৃহস্থ প্রতিমাসে পাবে ২০০০ টাকা করে। ধনীদের উপর কর বসিয়ে এই ভর্তুকির টাকা বাড়ানো যেতে পারে। এই ভাবে সাধারণ মানুষ মাসিক ৩০০০ টাকা করে পেতে পারে, এবং তা সরকারের উপর অতিরিক্ত চাপ না বাড়িয়েই ।

ত্রিদণ্ডীস্বামী পরাঙ্কুশ রামানুজ মহারাজ

এক প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ

বাসুদেব ঘোষ

হুগলী জেলার মগরা থানায় দিগসুই একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম, শ্রীশ্রী সীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ দেবের গুরুধাম, নাম-সাধনার সূতিকাগার। গ্রামে একজন পাশ করা ডাক্তার আছেন। ডাক্তারবাবু সাইকেল চাপতে পারেন না, কিন্তু আশপাশের অনেক গ্রামে ডাকে যেতে হয়। একটি ঘোড়া কিনলেন, ঘোড়ায় চেপে ডাকে যাবেন। সমস্যা হলো ঘোড়াটিকে বশে আনা নিয়ে। পিঠে চাপলেই লাফিয়ে সোয়ারীকে ধরাশায়ী করছে। অনেকেই চেষ্টা করেছে, সফল হয়নি। এগিয়ে এল গ্রামেরই সংস্কৃত চতুষ্পাঠীর এক তরুণ ছাত্র। সাহসী যুবক, ঘোড়ার পিঠে চাপতেই ঘোড়ার লাফালাফি, আরোহীকে মাটিতে ফেলার চেষ্টা। যুবক দৃঢ়মুষ্টিতে ঘোড়াকে ধরে আছে। ঘোড়া ছুটতে শুরু করল সোয়ারীকে নিয়ে, ঘণ্টা খানেকের উপর ছোটাছুটি করে ক্লান্ত হয়ে ঘোড়াটি নিজেই থামল। দৃপ্ত সোয়ারীও নামলেন। এইভাবে কয়েকদিনের প্রচেষ্টায় ঘোড়াটিকে পোষ মানানো গেল। ডাক্তারবাবু নিশ্চিন্ত হলেন। এই যুবকের অতি সাহসের পরিচয় ইতিপূর্বেই পাওয়া গেছে। হুগলী জেলা থেকে সুদূর নোয়াখালিতে ছেচল্লিশের দাঙ্গার সময় বালক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর হয়ে কাজ করেছেন। পায়ে হেঁটে, নৌকাযোগে ত্রাণ সরবরাহ করা, খবর আদান-প্রদান করা, রসদ যোগান ইত্যাদি কাজ সাহস এবং সফলতার সঙ্গে করেছেন। পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলে, কর্মকর্তাদের নির্দেশে পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে স্বস্থানে ফিরে এসেছেন, তখন তাঁর বয়স ১৪/১৫ বৎসর।

কে এই সুউন্নত, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, সৌম্য দর্শন সাহসী যুবক? নাম চিন্তাহরণ, হুগলী জেলার ধনিয়াখালি থানার বালিডাঙ্গা গ্রামের ঘোষাল পরিবারের সুসন্তান, বর্ধিষ্ণু আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পরিবার। পরিবারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রাঢ়েশ্বরী মাতা নিত্য পূজিতা। জন্মগ্রহণ করেন ১৩৪০ বঙ্গাব্দের ২০ ভাদ্র। জন্মগ্রহণের সময় অলৌকিক ঘটনা, প্রভাত শঙ্খ ধ্বনিত হয়েছিল পাশের লক্ষ্মী-নারায়ণ বিগ্রহ অধিষ্ঠিত ভাণ্ডার ঘরে। সেই দিনেই মূল বাড়ি নিলাম মুক্ত হওয়ায় পিতৃদেব নাম রাখেন 'চিন্তাহরণ'।

গ্রামের পাঠশালায় পড়াশোনা শুরু। পাশের গ্রাম থেকে উচ্চ প্রাথমিক পাশ করার কিছুদিন পরে অসুস্থ বাবার সেবার জন্য চিতেরমার আড্ডা আশ্রমে এলেন। পিতৃদেব নামপ্রেমী ঠাকুর শ্রীশ্রী সীতরাম দাস ওঙ্কারনাথ দেবের আশ্রিত শিষ্য সন্তান। তাঁর প্রতিষ্ঠিত নাম প্রচারের আদি মূলকেন্দ্র এই আশ্রমে পূজা-পাঠ— নাম-সংকীর্তন নিয়ে থাকেন, কিন্তু অত্যন্ত অসুস্থ। কয়েকবার নিউমোনিয়া হয়েছে, তার উপর কাশির উপদ্রব। এই অসুস্থ পিতৃদেবের সেবায় বালক চিন্তাহরণের আশ্রমে আগমন। নামেই আশ্রম, ছিটে বেড়ার তালপাতার আটচালা ঘর। এখানে থেকে বাবার সেবা-শুশ্রূষার সঙ্গে তার পূজা-পাঠে সহায়তা করা। পড়াশোনা শুরু হলো পাশে দিগসুই গ্রামের M.E. স্কুলে (তখনকার দিনের Middle English স্কুল, ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত)। ষষ্ঠ শ্রেণী উত্তীর্ণ হলেন। ইতিমধ্যে উপনয়ন সংস্কার হয়েছে, ডুমুরদহে ব্রজধাম নিকেতনে (ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের পৈতৃক ভিটা)। যাতায়াত বাড়তে লাগল দিগসুই গুরুধামে— ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের গুরুদেব শ্রী দাশরথিদেব যোগেশ্বরের বাড়ীতে। বাড়ীতে সংস্কৃত টোল আছে। আচার্য গুরুপুত্র শ্রী শ্যামাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়। পিতৃদেবের আগ্রহে সেই টোলে ভর্তি হলেন। একসঙ্গে চলতে থাকল আশ্রমে পিতৃসেবা, ঠাকুর সেবা (১৭টি শিবের পূজা করতে হোত), দু-কিলোমিটার দূরে দিগসুই টোলে আচার্যের বাড়ীতে পড়াশোনা, সেইসঙ্গে বাড়ির কাজে সহায়তা করা, ফাইফরমাস খাটা, প্রয়োজনে গৃহদেবতা গোপাল ঠাকুরের পূজা-অর্চনা। রাত্রে আশ্রমে ফিরে আশ্রমিক সমস্ত কাজ সমাধা করা। ভোরে ওঠা থেকে রাত্রে শোয়ার আগে পর্যন্ত সমস্ত কাজ স্বচ্ছন্দে, আনন্দে, প্রেম-ভক্তি সহকারে সমর্পিত মনে করতেন। সকলেই তাঁর কাজে তৃপ্ত। ইতিমধ্যে ওঙ্কারনাথদেব তাঁকে গুরুবাড়ীতে দীক্ষা দিয়ে শিষ্যত্বে বরণ করেছেন। পিতৃসেবার সঙ্গে যুক্ত হলো গুরুসেবা। গুরুদেবের আগ্রহে গ্রামের টোল ছেড়ে শ্যামনগর মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হলেন। তখন স্বদেশী যুগ চলছে। কলেজে বিপ্লবীদের যাতায়াত আছে। পড়াশোনার সাথে তাদের ভাব-ধারাতেও যুক্ত হয়েছেন। চিতেরমার আড্ডা আশ্রম থেকে শ্যামনগর নিত্য যাতায়াত এখনকার মতো এত সুবিধা ছিল না। পিতৃদেবের অসুস্থতা চরমে। সে কারণে কলেজের অন্তিম উপাধি পরীক্ষা দেওয়া হলো না। গ্রামের বাড়ীতে মাতৃদেবী পূর্বেই গত হয়েছে। তাঁর কোলে মাথা রেখে পিতৃদেবও অমৃতলোকে চলে গেলেন, প্রাণঢালা আশীর্বাদ দিয়ে। এখন সম্পূর্ণ নিরালম্ব— একমাত্র অবলম্বন গুরুদেব শ্রীশ্রী ওঙ্কারনাথ ঠাকুর।

পিতৃদেব এবং গুরুদেব ব্যতীত আর একজনের অকুণ্ঠ আশীর্বাদে তিনি ধন্য

হয়েছেন। তিনি হলেন এক ভৈরবী মাতা, মাঝে মধ্যে আশ্রমে আসতেন, সেবা-যত্ন পেতেন, ৯৯ বছর বয়সে ভৈরবী মাতা চিন্তাহরণের কোলে মাথা রেখেই অনন্তলোকে যাত্রা করেছেন।

গুরুদেবের নির্দেশেই আশ্রমিক পূজা-পাঠ, নাম-সংকীর্তন, নাম প্রচার চলছে। গুরুদেব তো স্বয়ং নামাবতার শ্রীশ্রী সীতারাম দাস ওঙ্কারনাথদেব। চৈতন্য মহাপ্রভুর পর সারা বাংলা তথা, সমগ্র ভারতে হরিনামের বন্যা এনেছেন তিনি। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা থেকে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে আপামর জনসাধারণ এমনকী যুবকেরা পর্যন্ত তাঁর প্রচারিত নামে মেতে উঠেছে। বাংলার বিভিন্ন স্থানে এবং ভারতের প্রমুখ তীর্থক্ষেত্র সমূহে মঠ-মন্দির স্থাপন করে সমাজের সমস্ত বর্ণকে জয়গুরু সম্প্রদায়ে একীভূত করেছেন। আর এই মহতী ঈশ্বরীয় কাজে তাঁকে যোগ্য সহায়তা দান করেছেন তাঁর শিষ্য যোগ্য সাথী সেবক চিন্তাহরণ। নাম প্রচারে এবং চাতুর্মাস্যে (প্রতি বৎসর বিভিন্ন স্থানে হোত) তিনি অকুণ্ঠ সহায়তা করেছেন। সেই সঙ্গে চলেছে ধ্যান-ধারণা এবং আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকলাপ। ওঙ্কারনাথদেবের বহুমুখী প্রতিভা, অত্যুচ্চ আধ্যাত্মিক সমাধিস্থ চেতনার-স্পর্শে, তাঁর মধ্যেও দিব্যভাবের স্ফুরণ ঘটে। বাল্যকালেই একবার রাঢ়েশ্বরী মায়ের সাক্ষাৎ দর্শন পেয়েছেন। এসবের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া এই প্রতিবেদকের অত্যন্ত সীমিত জ্ঞানে সম্ভব নয়। এইসব বিষয়ে জানতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের ওঙ্কারনাথদেবের জীবনী গ্রন্থ এবং পরাঙ্কুশ রামানুজ জীয়র মহারাজের আত্মজীবনী ''স্মৃতির সরণী বেয়ে'' পড়তে হবে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'ওঙ্কার আলোক' পত্রিকায় তাঁর সম্বন্ধে লেখা শিষ্য ভক্তদের স্মৃতিচারণা পড়তে হবে। হ্যাঁ, 'চিন্তাহরণ' কবে 'পরাঙ্কুশ রামানুজ জীয়র' হলেন— এ প্রশ্ন জাগতেই পারে। ওঙ্কারনাথ দেবের অগণিত শিষ্য ভক্ত আছেন। তাঁরা তাঁকে ভগবানের অবতার বলেই মানে। এমনকী অনেক মুসলমান এবং খৃস্টানও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তিনি যেহেতু গৃহীসাধক ছিলেন, সেজন্য কাউকে সন্ন্যাস দীক্ষা দেননি। শুধু তাঁর প্রমুখ ৮ জন শিষ্যকে সন্ন্যাস দীক্ষার ব্যবস্থা করেন দক্ষিণ ভারতের প্রমুখ সন্ন্যাসী শ্রীমন্ লক্ষণ রামানুজ জীয়রের কাছ থেকে। এই ৮ জনের অন্যতম হলেন চিন্তাহরণ। সন্ন্যাসের পর নাম হলো ত্রিদণ্ডী স্বামী পরাঙ্কুশ রামানুজ জীয়র। এঁরা রামানুজ সম্প্রদায়ভুক্ত।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর সর্ববিধ কাজ দ্বিগুণ উৎসাহে চলতে থাকল, গুরুদেবের সঙ্গে সমানতালে, ওঙ্কারনাথদেব তখন সারা ভারতে অধ্যাত্ম জগতে একজন পুরোধা ব্যক্তিত্ব। সরকারী-বেসরকারী উচ্চশিক্ষিত বহুগণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। সর্বত্র তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে। সেই সঙ্গে শিষ্যের নামও সকলের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে, তাঁর আচার-আচরণ-ব্যবহার এবং সেবা ও ভক্তির পরাকাষ্ঠায়। গুরুর যোগ্য উত্তরাধীকারী রূপে অনেকেই তাঁকে দেখতে শুরু করেছেন।

কালের অমোঘ নিয়মে গুরুদেব ওঙ্কারনাথ ঠাকুর মর্ত্যলীলা সংবরণ করে বৈকুণ্ঠলোকে গমন করলেন। গুরুদেবের তাবৎ উত্তর দায়িত্ব বর্তাল পরাঙ্কুশ রামানুজ জীয়রের উপর। গুরুদেবের মূল আশ্রম চিতেরমার আড্ডার রামানন্দ মঠকে কেন্দ্র করে তিনি ঠাকুরের যাবতীয় কাজ যথা— নামপ্রচার, প্রতি বছর চাতুর্মাস্য করা, মঠ-মন্দির স্থাপন, গৃহী-ভক্তদের (সর্ব বর্ণের স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে) দীক্ষা দান, বিভিন্ন আশ্রমে এবং মঠে পূজা-পাঠ, যাগ-যজ্ঞ এবং নর-নারায়ণ সেবা ইত্যাদি সমস্ত কাজ সুষ্ঠুভাবে ঈশ্বরীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে করেছেন, প্রাণঢালা ভালোবাসা এবং আনন্দ দিয়ে। যারা এর রসাস্বাদন করেছে, তারাই কেবল এর নান্দনিক অনুভূতি পেয়ে ধন্য হয়েছে, কৃতার্থ হয়েছে। চিতেরমার আড্ডার মূল মঠের সংস্কারসহ দ্বিতলে ভব্য রামমন্দির, জন্মস্থান বলিডাঙ্গায় আশ্রম প্রতিষ্ঠা। এছাড়াও ৬টি বিভিন্ন জায়গায় মঠ-মন্দির স্থাপন করেছেন। সর্বশেষ আশ্রমটি হয়েছে শৈবতীর্থ তারকেশ্বরে। একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। ত্রিবেণী আশ্রমে সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় স্থাপনে আগ্রহী হয়েছিলেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা এবং প্রশাসনিক কারণে সেটা বাস্তবায়িত হয়নি। এই সমস্ত মঠ-মন্দিরগুলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য গুরুদেবের নির্দেশিত পথ এবং নিজস্ব ভাবধারার অনুকূল একটি সঙ্ঘ ''ওঙ্কার সেবক সঙ্ঘ'' করেছেন। ৮ জন নবীন শিষ্যকে সন্ন্যাস গুরু লক্ষণ রামানুজ জীয়রের প্রেরণায় সন্ন্যাস দীক্ষা দিয়েছেন। তাঁদের বিভিন্ন মঠ-মন্দির পরিচালনার দায়িত্বে নিযুক্ত করেছেন। সঙ্ঘের বার্তা ও মঠের ভাবধারা সর্ব সমক্ষে প্রচারের জন্য একটি দ্বি-মাসিক পত্রিকা 'ওঙ্কার আলোক'-এর প্রবর্তন করেছেন। প্রতি বৎসর মঠে দুর্গাপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা, রথযাত্রা ইত্যাদি মহোৎসব, দরিদ্রদের বস্ত্রদান, ব্রাহ্মণ-সন্তানদের উপনয়ন, অভাবী কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাদের সাহায্য, দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালনা ইত্যাদি নানাবিধ সামাজিক কাজে তিনি সফল অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন। তাঁর আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক কাজের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেওয়া বর্তমান প্রতিবেদকের কাছে, সেই বহুচর্চিত নুনের পুতুলের মতো, যে সমুদ্রের গভীরতা মাপতে গিয়েছিল।

শিষ্য ভক্ত এবং আপামর জনসাধারণের কাছে তিনি ছিলেন গুরুদেব, ধর্মাচার্য, উচ্চ কোটির সন্ত-মাহাত্মা, ঈশ্বরকল্পপুরুষ যারা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ এবং বিশ্বহিন্দু পরিষদের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত, যাঁরা তাঁর নিকট সান্নিধ্যে এসেছে, তারা তাঁর অত্যুচ্চ আধ্যাত্মিক স্থিতির সঙ্গে, গভীর দেশ-প্রেম, প্রখর জাতীয় চেতনা এবং রাষ্ট্রীয় ভাবনার পরিচয় পেয়েছে। সঙ্ঘ এবং পরিষদের কাজে উনি সব সময়ে, সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন। ১৯৬৯-৭০ সনের কথা, হুগলী জেলার এতৎ অঞ্চলে সঙ্ঘ কার্য শুরু হয়েছে। তাঁর আগ্রহ এবং আনুকুল্যে চিতেরমার আড্ডা আশ্রমে তৎকালীন বঙ্গের প্রান্ত সঙ্ঘচালক শ্রী কেশবচন্দ্র চক্রবর্তীর (মাস্টারমশাই) উপস্থিতিতে সঙ্ঘের কার্যকর্তা এবং স্বয়ংসেবকদের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তারপর থেকে তাঁকে আমরা সঙ্ঘ এবং পরিষদের বিভিন্ন কার্যক্রমে পেয়েছি, কখনও সভাপতি হিসাবে, কখনও প্রধান অতিথি রূপে। প্রতি ক্ষেত্রেই প্রেরণাদায়ী, হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য রেখেছেন। রামমন্দির আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হয়েছেন। পরিষদের প্রান্ত মার্গ দর্শক মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ছিলেন। প্রবল বাধা উপেক্ষা করে রামশিলা যজ্ঞে অংশগ্রহণ করেছেন।

প্রশাসনিক বাধা অগ্রাহ্য করে তাঁর আশ্রমে শ্রীরাম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছেন। সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ার-এর জন্মশত বর্ষে উনি হুগলী জেলা কমিটির উপদেষ্টা মণ্ডলীর প্রধান ছিলেন। শ্রীগুরুজীর জন্মশতবর্ষে প্রান্তের সন্ত উপদেষ্টা মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ছিলেন। ২০০৬ সনে ডিসেম্বর মাসে শ্রীগুরুজীর জন্মশত বর্ষে কলকাতা টালা পার্কে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক কার্যক্রমে অসুস্থ শরীর নিয়েও উপস্থিত হয়েছেন। 'স্বস্তিকা'র বাৎসরিক গ্রাহক ছিলেন। দেখা হলেই সঙ্ঘ এবং পরিষদের বিভিন্ন কার্যক্রমের খোঁজ-খবর নিতেন। তিনি এমনই একজন সর্বজনমান্য, সর্ব গুণান্বিত, প্রখর ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুরুষ। কিন্তু ব্যবহারে সদা হাস্যময়, নিরহঙ্কার, আকুল করা ভালোবাসায় ভরা, অমায়িক ব্যবহার— যেন কত আপনজন। একটি ঘটনার কথা মনে পড়েছে। সঙ্ঘের প্রান্তীয় এবং ক্ষেত্রস্তরের (সঙ্ঘচালক, প্রচারকসহ) কয়েকজন কার্যকর্তা কোনও উপলক্ষে বীরপালা গ্রামে যাচ্ছিলেন। পথেই চিতেরমার আড্ডা আশ্রম। তাঁর আশ্রমে স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, সে কী সাদর আন্তরিক-হৃদ্য সম্বর্ধনা। বললেন, তাঁরা আমাদের দেখতে আসেননি, আমাদিগকে দর্শন দানে ধন্য করতে এসেছেন, সত্যই, মহতের প্রকাশ তো এভাবেই ঘটে।

দীর্ঘ রোগ ভোগের পর এরূপ এক মহাজীবনের মহাপ্রয়াণ ঘটল গত গুরু পূর্ণিমার পূর্বদিন, ২৯ আষাঢ় ১৪১৮, দুপুর ২ ঘটিকায় (পূর্ণিমা তিথি তখন শুরু হয়ে গেছে)। সকলের জন্য নিজের জীবনকে নিংড়ে দিয়ে চলে গেলেন। রেখে গেলেন তাঁর ভাবধারা, কর্মধারা এবং কর্মযজ্ঞ। আর অসমাপ্ত কাজের উত্তর দায়িত্ব দিয়ে গেলেন তাঁর অগণিত শিষ্য-ভক্ত- অনুগামী-অনুসারী ব্যক্তিগণের উপর।

পরাঙ্কুশ মহারাজের সব বিষয়ই ছিল মর্মস্পর্শী : স্বামী রাম রামানুজ

ত্রিদণ্ডী স্বামী পরাঙ্কুশ মহারাজের জীবনাবসানের পর স্বস্তিকা-র পক্ষে অঞ্জন কুমার বিশ্বাস তাল্যাণ্ডু রামানুজ মঠের সেবক ত্রিদণ্ডী স্বামী রাম রামানুজ জিউ-র সাক্ষাৎপ্রার্থী হন। একান্ত সেই আলাপচারিতায় পরাঙ্কুশ মহারাজের

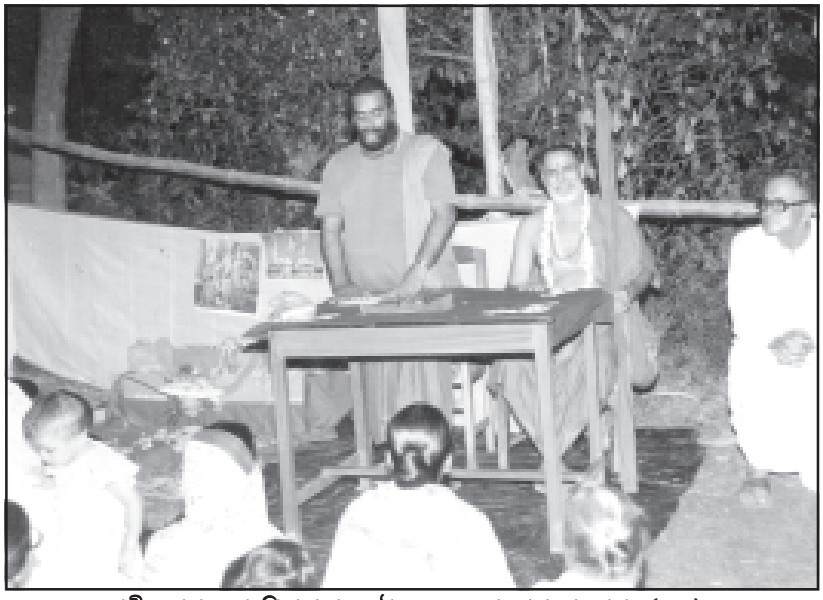

হুগলীর মগরাতে রামশিলা পূজা অনুষ্ঠানের এক সভায় পরাঙ্কুশ মহারাজ (বসে)।

জীবনবৃত্তান্তের কিছু প্রাসঙ্গিক অংশ উঠে আসে। এখানে সেই আলোকিত অংশবিশেষ প্রকাশ করা হলো।

—সঃ স্বঃ

❑ মহারাজের পিতৃপরিচয় যদি বলেন।

● পিতৃপরিচয় বলতে তাঁর জন্ম ঘোষাল পরিবারে, পিতা রুক্মিণী প্রসাদ ঘোষাল।

❑ মহারাজেরা ভাই-বোন ক'জন?

● তিন ভাই ও তিন বোন।

❑ এই চিতারমার আড্ডায় মঠ ছাড়া মহারাজ কি অন্য কোনও মঠ-মন্দির করে গেছেন?

● হুগলী জেলাতে মোট ৭টি মঠ রয়েছে—(১) রামানন্দ মঠ, চিতারমার আড্ডা দিগসুই, হুগলী স্টেশন-ত্যালাণ্ডু, (২) রামানুজ সীতারাম মঠ, ওঁকারতলা, ত্রিবেণী, হুগলী, (৩) সীতারাম স্মৃতি মন্দির, বালিডাঙ্গা, খানপুর, হুগলী, (৪) জগন্নাথ মন্দির, রামানুজ কুঞ্জ, চিতারমার আড্ডা, হুগলী, (৫) শ্রীরাম জানকী মঠ, কৃষ্ণবাজার, তারকেশ্বর, হুগলী, (৬) সীতারাম মিলন মন্দির, জাঙ্গিপাড়া, হুগলী, (৭) রাধাগোবিন্দ মন্দির, গুড়বাড়ী হুগলী। এছাড়া বর্ধমান জেলায় (১) কালিয়ারা ভবতারিণী মঠ, "ওঁকার ধাম" কালিয়ারা, বর্ধমান। (২) রাম-জানকী মন্দির-মধুপুর, বর্ধমান। এবং ঝাড়খণ্ডে ওঁকার মিলন মন্দির, বাড়মেশিয়া, ধানবাদ, ঝাড়খণ্ড।

❑ মহারাজ সেবা কাজের মধ্যে কি কি করে গেছেন?

● মহারাজের কাজের পুরাটাই সেবা ভাবনার কাজ। রামানন্দ মঠে 'ওঁকার সেবা সংঘের' নামে দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালনা হয়। যেখানে চক্ষু ছানি বিনা ব্যয়ে করিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে। এ পর্যন্ত ৩/৪ হাজার চক্ষু অপারেশান হয়ে গেছে। এখন প্রতি বছর প্রায় ১০০ চক্ষু রোগীকে মেডিকেল কলেজ থেকে চক্ষু অপারেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দরিদ্রদের জন্য অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার ব্যবস্থা আছে? কমলা মাতা শিশুনিকেতন নামে বিদ্যালয় প্রায় বিশ বছরের ওপর দেবানন্দপুর, তারাবিহারী, বারল (দিল্লি রোডের পাশে) চলছে। মহারাজ সহস্রাধিক ছেলেমেয়ের বিবাহ ও উপনয়ন নিখরচায় করিয়েছেন। সমস্ত খরচা আশ্রমের। মহারাজ গো-মাতার সেবায় প্রথম থেকে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি মঠে গো-সেবার জন্য একটি গো-শালা করেছেন এবং এখন গো-শালাতে ১৮টি গো-ধন আছে।

❑ শিক্ষা বা প্রচার নিমিত্ত কোনও পত্রিকা মহারাজ বের করেন কি?

● দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে শিক্ষামূলক, ধর্মীয় (আধ্যাত্মিক) ব্যাপারে নিজস্ব উপলব্ধি, গৃহী লোকদের জন্য কর্তব্য বিষয়ে তাঁর বাণী "ওঁকার আলো পত্রিকা বের হোত।

❑ মহারাজের কোনও পুস্তক আছে কি?

● মহারাজের নিজস্ব লেখা : (১) স্মৃতির সরণী বেয়ে (দুই খণ্ডে), (২) অরবের বরে, (৩) ওঁকারের ঝঙ্কার। এই বইগুলি সাধুসন্ত ও ভক্তজনদের কাছে বিশেষ সমাদর লাভ করেছে।

❑ বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজ?

● স্বামীজী ভারতের উত্তর থেকে দক্ষিণে এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমে হরিনাম প্রচার করে গিয়েছেন।

❑ স্বামীজীর সব থেকে কোন বিষয় আপনাকে বেশী প্রভাবিত করেছে।

● তাঁর সব বিষয়ই মর্মস্পর্শী। তবু বলি, এত উচ্চস্তরের একজন সন্ত হওয়া সত্ত্বেও খুব সাধারণের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যেতেন।

❑ তাঁর শেষ ইচ্ছা কি ছিল?

● সংস্কৃতির ভিত্তিতে অখণ্ড ভারত গঠন ও সবার জন্য অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থান। আর নিজের মঠে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা।

❑ সে ইচ্ছা পূরণ করা গেছে?

● ১৪ জুলাই ২০১১ বাংলা ২৯ আষাঢ় ১৪১৮ সাল বৃহস্পতিবার গুরুবারে গুরুপূর্ণিমা তিথিতে তাঁকে কলকাতা থেকে মঠে দুপুর ১২-৩০ মিনিটে নিয়ে আসা হয়। বেলা ২টার সময় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

উন্নয়নের স্বপক্ষে গল্প-কথকতা

অন্য রকম

বিশেষ প্রতিনিধি।। 'সহজ কথা যায় না বলা সহজে' এই সত্যিটা অনেক সময়েই মনে রাখেন না প্রচার জগতের লোকজন। প্রচারের ঢাক বাজানোর সময় তাঁদের খেয়াল থাকে না, সাড়ম্বরে প্রচারে দেদার ব্যয় হলেও তা লোকজনের মন ছুঁতে পারছে না। মাথার উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। প্রচারের সাফল্য ও ব্যর্থতার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে অনেক অঙ্ক। অঙ্ক মেলাতে পারলে প্রচারের রথ বিনা বাধায় এগোবে। প্রচারদক্ষ ব্যক্তিরা সামনে রাখেন সাধারণ মানুষকে। সাধারণ মানুষের মন মানসিকতা দৃষ্টিভঙ্গি সব বুঝে তাঁরা প্রচার পদ্ধতি ঠিক করেন। মজার ছবি আর কথা দিয়ে আকর্ষণীয় ভাবে সাজিয়ে গল্পচ্ছলে কোনও বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করলে ভালো সাড়া মেলে। জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতায় যা কখনও মেলে না। এটা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বুঝেছিলেন শরদ শর্মা। তিনি মজার ছবি ধারাবাহিকভাবে এঁকে গল্প শুনিয়ে প্রচারের একটা দিকে সাফল্য পেয়েছেন। উন্নয়নমূলক বা জনহিতকর কোনও বার্তা রস-কষহীন বিজ্ঞাপন প্রচারের সময় 'জনস্বার্থে প্রচারিত' লেখা থাকলেও তা জনগণের কাছে পৌঁছোয় না ঠিকভাবে। অনেকরকম অঙ্কের খেলা থাকে মাঝপথে। তার ফলে অদক্ষ এবং সামান্য বিদ্যাবুদ্ধির মানুষরা বিজ্ঞাপন বা প্রচারকে জটিল করে ফেলেন। কিন্তু একটু চিন্তাভাবনা যদি প্রচার- পরিকল্পনার সঙ্গে যোগ হয় তাহলে সাড়া মিলবেই। জনস্বার্থে যা প্রচারিত হবে তার তিনটি দিক আছে। প্রথমত, যে বিষয়ে প্রচার তার সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। দ্বিতীয়ত, ছবি আর লেখা আকর্ষণীয় হওয়া চাই। তৃতীয়ত, প্রচারে নতুনত্ব রাখা প্রয়োজন।

এরকম নীতিনিয়মে প্রচার কর্মসূচি তৈরি করে যথেষ্ট সাফল্য পেয়েছেন শরদ শর্মা। তিনি বলতে চান, গ্রামে গ্রামে গল্প কথকরা ছড়িয়ে পড়লে অনেক কাজ খুব ভালোভাবে হতে পারে। সেই গল্পের মূল বিষয় হবে উন্নয়নের সপক্ষে। কারও কাছে দুর্বোধ্য হয়ে উঠবে না। শরদ শর্মা ভারতের সব প্রদেশের কিছু গ্রামবাসীকে তালিম দিয়েছে প্রচারের কাজে অংশ নেওয়ার জন্যে। তিনি নিজে এঁকেছেন, লিখেছেন। সবটাই ভালোবাসা ভালোলাগার কাজ। উন্নয়নমূলক কমিক। উত্তর-পূর্ব ভারতে তাঁর প্রথম কাজ।

ড্রয়িং রুম — গল্প-কথকতায় ১৫,০০০ মানুষকে প্রশিক্ষিত করেছেন শরদ্ শর্মা (ইনসেটে)

এসব নিয়ে ভাবছেন অনেক বছর ধরে। কিন্তু ওই ধরনের কমিক বিজ্ঞাপন বা প্রচারের ব্যবহার করতে রাজি হননি অনেকে। শেষে শরদ শর্মা নিজেই উদ্যোগী হন। তিনি নিজে গল্প লিখেছেন। এঁকেছেন। একার পক্ষে সব কাজ সম্ভব নয়। সেজন্যে গ্রামে গ্রামে ঘুরে আগ্রহী লোকজনদের বেছে নিয়ে তালিম দিয়েছেন। গল্পকথক তৈরি করেছেন। তাতে সাফল্য পেয়েছেন যথেষ্ট। তাঁর মত হলো, প্রত্যেক গ্রামে গল্প বলার লোকজন আছেন। গল্প শোনারও। যদি প্রচারের কাজ গল্পের মাধ্যমে হয় তাহলে অনেক জটিল বার্তাও সহজে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। ছবি এঁকে গল্প বলার কাজে শরদ শর্মা ১৫ হাজার গ্রামীণ মানুষকে তালিম দিয়েছেন। দূর-দূরান্তের গ্রামেও তিনি গল্প কথকদের বলছেন, পেনসিল ধরুন, আঁকতে শিখিয়ে দেবো। সেই আঁকার বিষয় হবে সাধারণ মানুষের নাগালের বিষয় নিয়ে। সব বার্তা হবে প্রাথমিক স্তরে। এর মাধ্যমে গ্রামের মানুষের নিজেদের প্রকাশ করার ভাষাও খুঁজে পাবে— এটা তিনি মনে করেন। দেশের যে সব অঞ্চলে অশান্তি সমস্যা খুব বেশি সেখানেও তিনি ওইভাবে সাধারণ জনসমাজকে কাজে লাগিয়ে বার্তা পৌঁছে দিতে উদ্যোগী হয়েছেন। জনহিতের বার্তা তৈরি হয়েছে গ্রামে, ছড়িয়ে পড়েছে গ্রামের ভিতরে। এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে। একেবারে সরাসরি গ্রামের মানুষ যুক্ত থাকায় এই প্রচারে ফল মিলেছে আশাতীত। দুর্নীতি, জীবনধারণ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবেশ, পরিকাঠামোর অভাব ইত্যাদি বহু বিষয় নিয়ে প্রচার হয়েছে। সংঘাত বা কঠিন দ্বন্দ্বের কাহিনী কম তৈরি হয়। কারণ গ্রামের মানুষকে সেগুলোর মধ্যে জড়াতে চান না শরদ শর্মা। যে সব সমস্যা আপেক্ষিকভাবে সহজ সরল তারই অনুকূলে প্রচার করলে সাড়া মিলবে সর্বস্তরে— এটা মনে করেন।

প্রত্যেক রাজ্যেই নিজের দলবল নিয়ে কাজ করছেন। স্থানীয় স্তরে কমিক ক্লাব গড়েছেন। তিনি মনে করেন, কঠিন সমস্যাকে কমিকের মাধ্যমে গল্প আকারে তুলে ধরলে লোকে বোঝে চটপট। তাতে ফলও মেলে।

শরদ শর্মা কমিক কাহিনী তৈরি করে বিভিন্ন পত্রপত্রিকাতেও পাঠান। গ্রামীণ স্তরের শিল্পীদের আঁকা ছবি দিয়ে ১১টা বইও বের করেছেন তিনি। দেশের বাইরেও আন্দোলনের কাজ করছেন। সাধারণ মানুষের আঁকা কার্টুন আর তাদের বলা গল্পের মাধ্যমে জনহিতের কাজে কোনও সীমানা মানতে তিনি নারাজ। কারণ সবদেশে এর প্রয়োজন আছে। নিজের দেশের কথা মনে রেখেছেন সবার আগে।

বিশ্বভারতীর ইতিহাসে এই প্রথম

রবীন্দ্রভবনের 'দৃশ্যমান অভিলেখ্যাগার' ব্যবহার করতে পারবেন গবেষকরা

বিশেষ সংবাদদাতা : শান্তিনিকেতন।। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রভবনের 'দৃশ্যমান অভিলেখ্যাগার' গবেষকদের জন্য খুলে দিতে চায় বিশ্বভারতী। কবির সার্ধশতবর্ষে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত করতেই এই সিদ্ধান্ত। রবীন্দ্রভবনে আন্তর্জাতিকস্তরের রবীন্দ্র সংগ্রহশালা নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গেই এই সুবর্ণ সুযোগ পাবেন গবেষকরা। রবীন্দ্র সম্পদে সমৃদ্ধ দৃশ্যমান অভিলেখ্যাগারে এবার গবেষকদের অনুমতি সাপেক্ষ প্রবেশ নিশ্চিত হবে।

রবীন্দ্রভবন সূত্রে জানা যায়, অভিলেখ্যাগারের প্রধান সম্পদ হলো বাংলা ও ইংরেজিতে লিখিত রবীন্দ্রনাথের কয়েকশত পাণ্ডুলিপি ও ফাইল। একই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের লেখা ও কবিকে লেখা বাংলা ইংরেজি পত্রাবলি— যা অভিলেখ্যাগারের অপর একটি মূল্যবান সম্পদ। রবীন্দ্রনাথের লেখা চিঠির সংখ্যাই প্রায় ছয় হাজার এবং তাঁকে লেখা পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় লিখিত বহু সহস্র পত্র প্রাপক বা প্রেরকের নামানুসারে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে রাখা আছে। এছাড়াও ঠাকুর পরিবারের চিঠিপত্র, দলিল ও অন্যান্য কাগজপত্র, জমিদারি সেরেস্তার হিসাব খাতা এবং বিশ্বভারতীর কাগজপত্র অভিলেখ্যাগারে সযত্নে রক্ষিত আছে। প্রায় ৮৬৪টি পাণ্ডুলিপি অভিলেখ্যাগারে সংরক্ষিত আছে। এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ১৮৭৪-১৮৮৪ সালে লেখা বিখ্যাত 'মালতি পুথি'র পাণ্ডুলিপি, 'পুরবী', 'গীতাঞ্জলি', 'বিচিত্রিতা', ইংরাজী গীতাঞ্জলি, নৈবেদ্য, মানসী, আকাশপ্রদীপ, খাপছাড়া, গীতিমাল্য, 'চণ্ডালিকা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুরুপাণ্ডব, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ডাইরী, 'বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ' উল্লেখ্য। ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী আত্মজীবনী অবনীন্দ্রনাথের আলপনা, দীনেন্দ্রনাথের রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপি, দ্বিজেন্দ্রনাথের কবিতা, স্বপ্নপ্রয়াণের মতো লেখার পাণ্ডুলিপি রয়েছে অভিলেখ্যাগারে। মৃণালিনীদেবীর মহাভারত ও উপনিষদ থেকে অনুবাদ। নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর ডাইরী। এছাড়াও ঠাকুর পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের রচনা সম্বলিত পাণ্ডুলিপি যা 'পারিবারিক খাতা' বলে পরিচিত এমন বহু রচনার পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রভবনের

অভিলেখ্যাগারে সযত্নে রক্ষিত রয়েছে বছরের পর বছর। রয়েছে রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহে থাকা কবির বহু চিত্রাবলী। কিন্তু কালের নিয়মে এগুলির অবস্থা ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। এবং সেইকালের সংরক্ষণ পদ্ধতিতেই রাখা হয়েছে এই মূল্যবান রবীন্দ্র সম্পদগুলি।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সংরক্ষণের কাজে যে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উচ্চ প্রযুক্তি ব্যবহার হয়, তা দীর্ঘদিন অর্থাভাবে প্রয়োগ করা যায়নি বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবন অভিলেখ্যাগারে। ফলে সেকালের প্রাচীন পদ্ধতিতেই আজ চলছে সংরক্ষণ। কিন্তু সংরক্ষিত বস্তুগুলির আয়ুষ্কাল ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে। তাই রবীন্দ্রভবন কর্তৃপক্ষ আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে সংরক্ষণ ও আন্তর্জাতিক মানে রবীন্দ্রসংগ্রহশালা নির্মাণের কাজ শুরু করেছে। রবীন্দ্রভবন সূত্রে জানা গেছে, এই সংগ্রহশালার কাজ শেষ হলে অভিলেখ্যাগারের 'দৃশ্যমান ভাণ্ডার' তৈরি করে গবেষকদের ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া হবে। যাতে রবীন্দ্রসম্পদ গবেষণা করে নিত্য নূতন তথ্য আবিষ্কারের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের নানা দিক উন্মোচিত হয়। এতদিন অভিলেখ্যাগার ব্যবহারের অনুমতি ছিল না গবেষকদের। রবীন্দ্রভবনের এই সিদ্ধান্তে রবীন্দ্রগবেষকদের কাছে নবদিগন্ত উন্মোচিত হবে বলে বিশিষ্টজনদের মত। তবে অভিলেখ্যাগার ব্যবহারের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রভবনের অনুমোদন বা অনুমতি আবশ্যক।

একই সঙ্গে 'দৃশ্যমান অভিলেখ্যাগার' ব্যবহারের ক্ষেত্রে বেশকিছু নিরাপত্তাব্যবস্থা, আপৎকালীন নিয়ন্ত্রণের কাজও শুরু করেছে বিশ্বভারতী। থাকবে রবীন্দ্রভবন জুড়ে গোপন ক্যামেরা, স্বয়ংক্রিয় এলার্ম, অভিলেখ্যাগার-এর আর্দ্রতা ও উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণে বিশেষ আধুনিক ব্যবস্থা। যার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। 'দৃশ্যমান অভিলেখ্যাগার' গবেষকদের ব্যবহার করতে দেবার সিদ্ধান্ত বিশ্বভারতীর ইতিহাসে এই প্রথম। স্বভাবত এই সিদ্ধান্তে খুশী রবীন্দ্র গবেষকমহল।

রবীন্দ্রভবনের প্রাধিকারিক নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, রবীন্দ্রভবনে আন্তর্জাতিক স্তরেও রবীন্দ্রসংগ্রহশালা নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। এই কাজের সঙ্গে সমগ্র রবীন্দ্রভবনের আধুনিকরণের কাজ চলছে। শীঘ্র এই কাজ শেষ হলে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে গবেষণার কাজের আরও উন্নতির লক্ষ্যে 'দৃশ্যমান অভিলেখ্যাগার' গবেষকদের ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হবে।

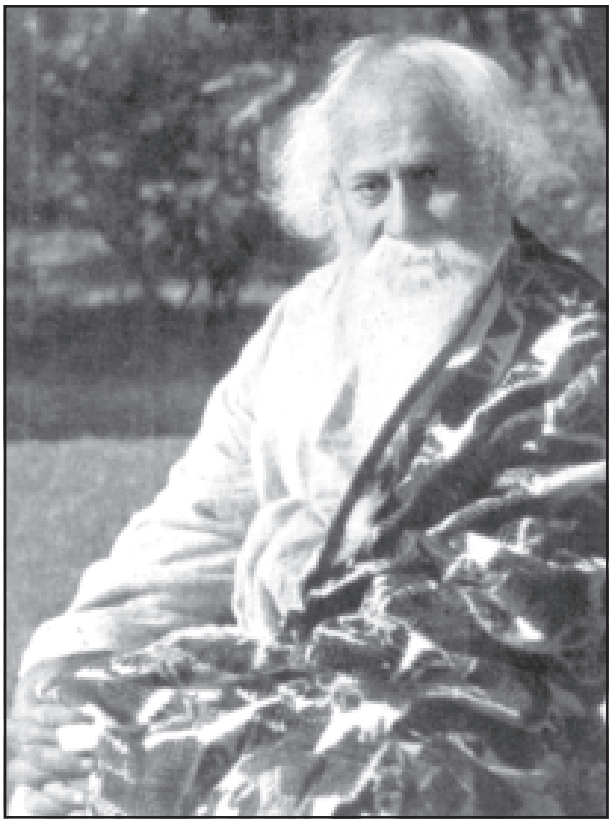

রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প ভাবনা ও বিশ্লেষণ

ডঃ সৌমিত্র মুখোপাধ্যায়

সাহিত্য-জননীর সর্বকনিষ্ঠ সন্তান ছোটগল্প। শিল্পকর্মের দিক থেকে ছোটগল্প গীতিকবিতার সমধর্মী। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকেই কথাসাহিত্যের এই নবীন রূপটি সাহিত্য-সংসারে নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে। ছোটগল্পের বিকাশ যন্ত্রযুগের বিবর্তনের সঙ্গেই সাধিত হয়েছে। একটি বিশেষ ভাব অথবা বিশেষ একটি ঘটনাকে স্বল্প আয়োজনে স্বল্পায়তনের মধ্যে ফুটিয়ে তোলাই তার লক্ষ্য—'to produce maximum effect with minimum materials.'

রুডিয়ার্ড কিপলিং বলেন, আধুনিক ছোটগল্প ঠিক চোরা লণ্ঠনের আলোর মতো। একটি বিশেষ বস্তুর উপরই সে তার সমগ্র আলোকপাত কেন্দ্রীভূত রাখবে, অনাবশ্যক ঘটনা ও চরিত্র-সন্নিবেশে কাহিনীকে ভারাক্রান্ত করে তুলবে না। উপন্যাসের স্পষ্টতা এতে নেই, আছে ব্যঞ্জনাময়তা। 'স্বল্পতম পরিসরের মধ্যে গূঢ়তম সত্যের ব্যঞ্জনা'-ই ছোটগল্পের যথার্থ প্রাণবস্তু।

পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রেরণায় এদেশে ছোটগল্প নবজন্ম লাভ করেছে। বাংলা ছোটগল্পের পথিকৃৎ ও মহৎস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ। বিশ্বসাহিত্যের ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ দুই শিল্পীর সমকক্ষ হওয়ার স্পর্ধা রাখেন— মোঁপাসা ও চেকভ। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প বিশ্বসাহিত্যের অনন্য সম্পদ। কারণ ছোটগল্পের রূপ ও রীতি প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠেছিলেন সিদ্ধ-শিল্পী এবং এই ক্ষেত্রে তাঁর সাধনা ও সিদ্ধি উত্তরকালের কাছে এক বিরাট আদর্শ।

ছোটগল্পের আঙ্গিক নৈপুণ্যে রবীন্দ্রনাথ অসামান্য এবং সার্থক। 'ছোটো প্রাণ, ছোটো ব্যথা, ছোটো ছোটো দুঃখ কথা/নিতান্তই সহজ-সরল,' এই ক্ষুদ্র পরিসরে কাহিনী ছোটগল্পের জীবনক্ষেত্র মণ্ডিত করেছে।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলিকে রচনার ক্রম অনুযায়ী তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়—

১ম পর্ব = ১৮৯১—১৯০১ হিতবাদী সাধনা পত্রিকার যুগ

১য় পর্ব = ১৯১৪—১৯৩০ ভারতী সবুজপত্রের যুগ

৩য় পর্ব = ১৯৩০—১৯৪০ তিনসঙ্গীর যুগ

'হিতবাদী' পত্রিকায় ১২৯৮ সালের প্রথম ছয় সপ্তাহে রবীন্দ্রনাথের ৬টি গল্প প্রকাশিত হয়। এগুলি যথাক্রমে 'দেনাপাওনা', 'পোস্টমাস্টার', 'গিন্নি', 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা', 'ব্যবধান', 'তারাপ্রসন্নের কীর্তি'।

রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলি গীতিধর্মী ধরনের। গোটা বাংলাদেশের বাস্তব চিত্র তাঁর ছোটগল্পগুলির মধ্যে রূপ লাভ করেছে। পদ্মাতীরের বুকে কবি প্রকৃতি ও মানুষের নিগূঢ় সম্পর্ক আবিষ্কার করেছিলেন এবং সাধারণ মানুষের সামাজিক জীবনের সমস্যাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তারই নানা সমস্যা, তারই গভীর ও জটিল শিল্পরূপ এই ছোটগল্পগুলি। এই গল্পগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে, কবির কল্পলোকের মানুষগুলি এখানে প্রকৃতির ছায়া, আলো, বর্ণ, গন্ধ, ধ্বনি ও ছন্দের সঙ্গে একান্তভাবে মিশে গিয়ে একটি সুরের জগৎ সৃষ্টি করেছে।

'পোস্টমাস্টার' রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিধর্মী ছোটগল্প। এই গল্পে জীবন ও প্রকৃতির দ্বৈততান ধরা পড়েছে। পোস্টমাস্টার ও রতনের সমাজ-বন্ধনে অস্বীকৃত স্নেহসম্পর্ক একটি করুণ বেদনাময় পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। গল্পের শেষে চরম দার্শনিক উপলব্ধি যা আমাদের বন্ধনমুক্ত বৈরাগী করে তোলে—'এ পৃথিবীতে কে কাহার'?

'দেনাপাওনা' গল্পে সমাজব্যবস্থার এক কলঙ্কিত অধ্যায় চিত্রিত। পণ ঠিকমত দিতে না

পারায় বাঙালি বধূকে শ্বশুরগৃহে যে নির্মম যন্ত্রণা সহ্য করতে হয় এবং শেষ পর্যন্ত যে আত্মহত্যা করতে হয় তা লেখক তুলে ধরেছেন এই গল্পে নিরুপমার মধ্য দিয়ে। 'আমি কি কেবল একটা টাকার থলি, যতক্ষণ টাকা আছে ততক্ষণ আমার দাম।' মাত্র কয়েকটি কথা। নিরু এখানে বিদ্রোহিনী এক নারী। কুৎসিত পণপ্রথার বিরুদ্ধে তার এই তীব্র প্রতিবাদ।

'গিন্নি' গল্পে শিবনাথ পণ্ডিতের হৃদয়হীন অত্যাচারী চরিত্র, 'ব্যবধান' গল্পে বৈষয়িকতার সঙ্গে হৃদয় মাধুর্যের দ্বন্দ্ব ও 'তারাপ্রসন্নের কীর্তি' গল্পে লেখক-জীবনের ব্যর্থতা প্রকাশ পেয়েছে। পুত্রের স্বার্থের বিরুদ্ধে আদালতে সত্য সাক্ষ্য দিয়ে এসে রামকানাই ঘরে যে অভ্যর্থনা লাভ করেছিল তার বর্ণনায় 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা' গল্পটি বড় করুণ।

'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথম গল্প 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন'। ভৃত্য রাইচরণের স্নেহ বাৎসল্যের এক অসামান্য চিত্র মনোবিশ্লেষণী ভঙ্গিতে পরিস্ফুট হয়েছে এই গল্পে। 'কঙ্কাল' গল্পে আছে এক অতিপ্রাকৃত পরিবেশে এক সুন্দরী যুবতী বিধবার ব্যর্থ প্রেম। 'জীবিত ও মৃত' গল্পটিতে বিশ্বাস্য ও অবিশ্বাস্য পরিবেষ্টনীর মধ্যে একটি করুণ কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে। 'কাবুলিওয়ালা' গল্পে বাৎসল্যরসের স্বতঃস্ফূর্ত নির্ঝরণীপ্রবাহ দেশ, কাল, জাতি, পরিচয়-এর সমস্ত বাধা অতিক্রম করে চিরন্তন মানব হৃদয়ের অতলান্ত সমুদ্র অভিমুখে প্রবাহিত হয়েছে। আর সেই সঙ্গে সৃষ্টি করেছে স্নিগ্ধ বাৎসল্য রসব্যঞ্জনার অনবদ্যতা। এইভাবে মানবহৃদয়ে অতলান্ত ব্যঞ্জনাদীপ্ত মুক্তাবিন্দুর সন্ধান পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের 'স্বর্ণমৃগ', 'ছুটি', 'জয়পরাজয়', 'দানপ্রতিদান', 'মধ্যবর্তিনী' প্রভৃতি গল্পে। নিম্নশ্রেণীর মানুষের জীবন কত কঠিন হতে পারে তার একটা নিখুঁত চিত্র পাওয়া যায় 'শাস্তি' গল্পে। গল্পটিতে রবীন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ বাস্তব দৃষ্টির পরিচয় রয়েছে।

'মহামায়া' গল্পটি তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। মহামায়ার অসাধারণ নারী-ব্যক্তিত্ব আমাদের বিস্মিত করে। এমন নারী চরিত্র রবীন্দ্রসাহিত্যে শুধু নয়, গোটা বাংলা সাহিত্যে একটা challenge। 'অনধিকার প্রবেশ' গল্পে বিধবা জয়কালীর ব্যক্তিত্ব প্রশংসনীয়। আচারধর্ম, শুচিবাইগ্রস্ততার ঊর্ধ্বে মানবতার জয় ঘোষিত হয়েছে এই গল্পে। নায়ক তারাপদর কথা লিখতে বসে 'অতিথি' গল্পে রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন প্রকৃতি ও ব্যক্তির নিবিড়তম সম্পর্কের কথা। 'সমাপ্তি' গল্পের নায়িকা মৃন্ময়ী তো তাঁর চোখে-দেখা মৃন্ময়ীমূর্তি। এই গল্পে নর-নারীর প্রেমসমস্যা প্রাধান্য পেয়েছে। 'সুভা' গল্পে বোবা মেয়ে সুভার সঙ্গে মৌন প্রকৃতির তুলনা বর্ণিত হয়েছে। 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পে ইংরেজ রাজকর্মচারীর স্বেচ্ছাচারিতা ও নেটিভদের অপমানের কথা তুলে ধরা হয়েছে। কোলরিজের 'christabel' কবিতায় দূর অতীতকাল, মধ্যরাত্রি, ব্যারনের দুর্গপ্রাসাদ বা দন্তহীন কুকুরের চীৎকার কিংবা ইংরেজকবি Walter De La Mare-এর ''The Listeners'' কবিতায় যে অতিপ্রাকৃত ভাবনা অতিচমৎকারভাবে পরিব্যক্ত হয়েছে তারই পদধ্বনি শোনা যায় রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'নিশীথে' প্রভৃতি গল্পে। রূপলাস্য মুখরিত ভোগ বিলাসের স্মৃতিবহ পরিত্যক্ত প্রাসাদ আজও প্রতিদিন তার অতৃপ্ত কামনার অতন্দ্র পিপাসা নিয়ে রাত্রির অন্ধকারে কেমন করে অস্থির সুকুমার মনকে স্নেহপাশে আবদ্ধ করে, তারই কাব্যধর্মী ও সুরধর্মী চিত্র রয়েছে 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পটিতে।

রবীন্দ্রনাথের গল্পরচনার দ্বিতীয় পর্ব ভারতী সবুজপত্রের যুগ। 'ভারতী' পর্বে তিনি ৭টি গল্প রচনা করেছিলেন—'দুরাশা', 'পুত্রযজ্ঞ', 'ডিটেকটিভ','অধ্যাপক', 'রাজটিকা', 'মণিহারা' ও 'দৃষ্টিদান'।

'দুরাশা' গল্পটি সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিতে রচিত। এক নারীর অপ্রতিহত, সর্বত্যাগী, তপস্যাপূত প্রেমের মর্মান্তিক বেদনা-সঙ্গীত এখানে প্রকাশিত হয়েছে। 'অধ্যাপক' গল্পে জনৈক অধ্যাপকের সাহিত্যিক খ্যাতিলাভের ব্যর্থ প্রচেষ্টার কথা স্থান পেয়েছে। 'মণিহারা' অনেকটা 'নিশীথে'র ন্যায়। সদ্য পত্নীবিয়োগবিধুর স্বামীর মনোবিকারের কাহিনী। এই গল্পে ফণিভূষণের স্ত্রী মণিমালিকার মৃত্যুরহস্য-গূঢ় স্বপ্নকাহিনী বাস্তব প্রতিবেশের মধ্যে অতিপ্রাকৃতের অরূপতায় আরও রহস্যঘন হয়ে উঠেছে। ফণিভূষণের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকদের মন যেন সন্দেহ দোলায় দোদুল্যমান হয়ে বলতে থাকে, ''Did I dream or wake?''

এছাড়া ভারতী পর্বে আরও দুটি গল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'রাসমণির ছেলে' ও 'পণরক্ষা'।

'সবুজপত্রে' রবীন্দ্রনাথের দশটি গল্প প্রকাশিত হয়— 'হালদারগোষ্ঠী', 'হৈমন্তী', 'বোষ্টমী', 'স্ত্রীর পত্র', 'ভাইফোঁটা', 'শেষের রাত্রি', 'অপরিচিতা', 'তপস্বিনী', 'পয়লা নম্বর' ও 'পাত্র-পাত্রী'।

'হালদারগোষ্ঠী' গল্পে বনোয়ারীলালের ব্যক্তিত্ব চেতনা, 'ভাইফোঁটা' গল্পে বিশ্বাস ও কাপট্যের দ্বন্দ্ব, 'অপরিচিতা' গল্পে পণপ্রথা, 'পয়লা-নম্বর' গল্পে বাঙালী সমাজের বিবাহে মধ্যস্থতার ভূমিকা প্রকাশ পেয়েছে। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনভাবনা ও সমাজভাবনার এক নতুন দিক পরিস্ফুট করেছেন। এই গল্পে মৃণালের চিঠি তার স্বামীর উদ্দেশে। চিঠিতে শুধুই প্রতিবাদ। স্বচ্ছলতার মধ্যেও মৃণাল তার স্বামীর ঘরে দেখেছে মানুষের অপমান, আভিজাত্যের গর্ব, অখণ্ড স্বার্থপরতা। চিঠিতে সে জানিয়েছে, 'তোমাদের গালিকে আর আমি ভয় করিনে। আমার সম্মুখে আজ নীল সমুদ্র, আমার মাথার উপরে আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জ।' মৃণাল বধূ জীবনের গণ্ডী পেরিয়ে এক দৃপ্ত নারী ব্যক্তিত্বে ভাস্বর। ইবসেনের 'A Doll's House'-এর নোরা চরিত্রে যে ব্যক্তিসত্তার পরিচয় পাওয়া যায় তা 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে মৃণালের ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে তুলনীয়।

রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে তিনটি ছোটগল্প লেখেন—'রবিবার', 'শেষকথা' ও 'ল্যাবরেটরি'। আঙ্গিক ও বক্তব্য দুই দিক থেকেই তিনসঙ্গীর গল্পগুলি অসামান্য। রবীন্দ্রজীবনের ও মননের একটি বিবর্তনের স্তরে এই গল্পগুলির প্রকাশ। 'তিনসঙ্গী'র প্রথম দুটি গল্প প্রেমকেন্দ্রিক। 'ল্যাবরেটরি' আইডিয়া এবং প্রতীক প্রধান। তিনটি গল্পের তিনটি প্রধান চরিত্র—অভীককুমার, অচিরা ও সোহিনী—সবাই প্রগলভ্‌বাক। তাদের অনুভূতি ও ভাবনা বিচিত্র; আদর্শ স্বতন্ত্র। প্রত্যুৎপন্নমতিও বিস্ময়কর। বুদ্ধি তাদের বিসর্পিত। প্রত্যেকে নিজেকে ভাল চেনে, তাই অন্যকে জানতে সাহস করে— অচিরার নৈর্ব্যক্তিক সতীত্ব ও জ্ঞানচর্চা, অভীককুমারের শিল্পানুভূতি ও নাস্তিকতা এবং সোহিনীর অসাধারণত্ব তার চিন্তায় ও ব্যবহারে প্রকাশ পেয়েছে।

আর্লেসাক্সলির উপন্যাসের মতো রবীন্দ্রজীবনের শেষ দিকের কথাতে এসেছে তর্কের সমষ্টি। তর্কের অন্তরালে স্পন্দিত হয়েছে আবেগময় হৃদয়। নতুন প্রয়োগের গল্প, নতুন টেকনিকের গল্প হিসাবে তাই তিনসঙ্গী স্মরণীয়।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প সর্বদিক থেকে এক অপূর্ব সৃষ্টি। নিবিড় কাব্যানুভূতি ও গভীর মানবচরিত্রাভিজ্ঞতা, জীবনসত্য ও কলাসুষমার এক অপরূপ সমন্বয়। উন্মনা চিত্তের অনির্দেশ্য বেদনা ও উন্মুখ প্রতীক্ষা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প আকাশ-বাতাসকে আবিষ্ট করে। তাই বাংলা ছোটগল্পের অঙ্গনে রবীন্দ্রনাথ অনন্যসাধারণ ও সার্থক শিল্পী।

গল্প

সেদিন অমরকণ্টকে

মানিকচন্দ্র দাস

একটা রেজিস্টার্ড বড়ো খাম। প্রেরকের ঠিকানা ভালো করে দেখলাম— অমরকণ্টকের মধ্যপ্রদেশ ট্যুরিজম্-এর হলিডে হোম, জনৈক শিবশরণ শর্মা। ঠিকানা পরিচিত, কিন্তু প্রেরককে চিনতে পারলাম না। বেশ যত্ন করে পাঠানো হয়েছে। আমার ঠিকানাও বেশ স্পষ্ট করে নির্ভুল ভাবে লেখা হয়েছে। খামটা খোলার সঙ্গে সঙ্গে একটা ছোটো কাগজ পড়ে গেল। তুলে দেখলাম একটা ছোটো চিঠি—কাকু, ছবিটা তোমাকে পাঠালুম—পুতুল।

সাদা শক্ত কাগজে দু-বার জড়ানো হয়েছে ছবিটা। ডাবল পোস্টকার্ড সাইজের একটা ছবি।

আবরণ খোলার সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক আলোর মতো চোখের উপর ভেসে উঠল অমরকণ্টকের সেই সাধুজির চেহারা। কী আশ্চর্য! এই ছবি তো আমি সেদিন ক্যামেরায় তুলেছিলাম। পঁয়ত্রিশটা ছবি একেবারে যথাযথ উঠল। কিন্তু সাধুজির ফিল্মটা ছিল শূন্য। সেই শূন্য জায়গাটা যদি পূর্ণ থাকত, তাহলে এই ছবিটাই সেখানে থাকত। ছবি তোলার সময় সাধুজি অবশ্য আপত্তি করেছিলেন; কিন্তু তখন আমি শাটার টিপে দিয়েছি।

কোথা থেকে তপন পেল এই ছবি। ছবিটা ভালো করে দেখলাম। ছবিতে একটি নামও হাতে লেখা আছে। নবীনানন্দ স্বামী। সাধুজীকে কতবার নাম জিজ্ঞেস করেছিলাম। আদৌ বলেননি। আজ ছবির সঙ্গে নামও লিখে দিয়েছেন। প্রণাম স্বামীজি।

ছ-জন ডাক্তারবন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে গেছিলাম নর্মদার উৎস অমরকণ্টকে, বছরখানেক আগে। ছ'জনের মধ্যে পিনাকীদা ও রমাবৌদি সবচেয়ে বেশি বয়সের— প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। এই দম্পতি সতীর্থ; দু'জনেই প্রতিষ্ঠিত স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ। পিনাকীদা হলেন পিনাকীরঞ্জন ভট্টাচার্য এম. ডি., এফ্. আর. সি. এস.। তাঁর বাবা ছিলেন বিখ্যাত অধ্যাপক ও অত্যন্ত ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি। তাঁর মামার বাড়ি ভাটপাড়ার বিখ্যাত ভট্টাচার্য পরিবার। এহেন পিনাকীদা ছিলেন একেবারে নাস্তিক। সমাজের নিম্নস্তরের মানুষের সঙ্গে উচ্চস্তরের মানুষদের প্রতি তাঁর সদয় ব্যবহার ছিল। তাদের সঙ্গে আচরণে এত বড়ো ডাক্তারের কোনও অহমিকার প্রকাশ হোত না। কিন্তু সাধু- সন্ন্যাসীদের তিনি আদৌ দেখতে পারতেন না; বরং সুযোগ পেলে তিনি তাঁদের হেনস্থা পর্যন্ত করতেন। রমাবৌদি তাঁর বিপরীত। দেব-দ্বিজে তাঁর খুব ভক্তি। যে কোনও সাধু-সন্ন্যাসী দেখলে তিনি তাঁর সঙ্গে কথা বলতেন। নানা তীর্থের কথা, তীর্থভ্রমণের কথা মন দিয়ে শুনতেন। অন্য চারজন ডাক্তার কোনও দলের নয়। দেবতা-ধর্ম মানলে হয়, না মানলেও চলে। বিশ্বাসে গদগদ হতে হবে, আবার অবিশ্বাসে সব কিছু উড়িয়ে দিতে হবে— এই দুই বিপরীত মেরুর মাঝামাঝি তারা যুক্তি-বিচার দিয়ে চিন্তা করার লোক।

তবে তারা সকলেই ডাক্তার অর্থাৎ বিজ্ঞানের লোক। আর আমি বিজ্ঞান কিছুই বুঝি না, যদিও আজ অঙ্ক নিয়েই আমার সব সময় কাটে। পিনাকীদা আর রমা বৌদি বাদে আর সকলেই আমার সতীর্থ। স্কুলে ও কলেজে কিছুদিন ওদের সঙ্গে পড়েছিলাম। এখন কর্মসূত্রে আয়কর বিভাগে আছি। সেই সূত্রে ওদের সঙ্গে পুরোনো পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে। তাদেরই সঙ্গে এসেছি পবিত্র নর্মদার উৎস রহস্য-সুন্দর অমরকণ্টকে। মধ্যপ্রদেশ ট্যুরিজম-এর হলিডে হোম-এ উঠেছি। গাড়ির গণ্ডগোলে কাল অনেক রাতে এখানে পৌঁছেছি। ভালো করে চারদিক দেখতে

পাইনি। সকালে উঠে ব্রেকফাস্ট সেরে বাইরে বেরোলাম।

পর্বতের চূড়ায় এই বিশাল হলিডে হোম। শহরের ভিড় ও কোলাহলের একেবারে বাইরে, অনেক উঁচুতে। ভারী সুন্দর জায়গা। দূর থেকে দেখতেও সুন্দর লাগে। এখান থেকে বহুদূরেও দেখা যায়—ধূম্র সবুজ পর্বত, সবুজ শাল-গাছের বন আর নীল আকাশের অপূর্ব মিতালি। হলিডে হোমের চারদিকে ফুলফলের গাছ। সবুজ ঘাসের লন, বোগেনভেলিয়ার রঙের বাহার। আশেপাশে গাছে চেনা-অচেনা পাখির কাকলি— মন আনন্দে সত্যি ভরে যায়।

সকালে নর্মদার উৎস ধরে হেঁটে চলেছি। চলার পথে কিছু স্থানীয় লোক ও কিছু ভ্রমণার্থীর সঙ্গে পরিচয় হলো। কয়েকজন বাঙালিকেও পেলাম। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি। ভ্রমণার্থীদের খুব ভিড় না থাকলেও জায়গাটায় অনেক লোক দেখলাম। তাদের মুখে শুনলাম— চক্রতীর্থে একজন বুড়ো সাধু এসেছেন। কিন্তু কেউ তাঁর নাম বা পরিচয় বলতে পারল না। স্থানীয় কিছু লোকের সঙ্গে হিন্দিতে কথা বলে কিছু আভাস পেলাম। সাধু বড়ো মেজাজী— ইচ্ছা হলে কথা বলবেন, নাহলে একেবারে মৌন। হয়তো একটু পরেই কোথাও চলে যাবেন। অনেকদিন আর তাঁর কোনও পাত্তা পাওয়া যাবে না। তবে চক্রতীর্থে তিনি মাঝে মাঝে আসেন।

উৎস থেকে অন্তত তিন কিলোমিটার দূরে নর্মদা অনেকটা অশ্বক্ষুরাকৃতি হয়ে বয়ে চলেছে। প্রায় তিনদিকে জলধারবেষ্টিত এই জায়গাটাই চক্রতীর্থ। জায়গাটা বন্ধুর ও কঙ্করময় হলেও কিছু অংশ বেশ সমতল। কাছেই এক বড়ো শ্মশান। মূলত এই শ্মশান ও শ্মশান-সন্নিহিত অঞ্চল চক্রতীর্থ নামে পরিচিত। ছোটো একটা আশ্রম আছে। কোনও কোনও জায়গায় সাধুরা গাছের তলায় বা ছোট্ট চালার মধ্যে বসে থাকেন— ধ্যান করেন।

সাধু-সন্ত সম্পর্কে আমার শ্রদ্ধামিশ্রিত অনন্ত কৌতূহল। চক্রতীর্থে সাধু- সন্তর সঙ্গে কথা বলব, তীর্থের অনেক গূঢ় কথা জানব বলে সেখানে উপস্থিত হয়েছি।

প্রায় ফুটখানেক জল। ঝিরঝির করে বয়ে চলেছে। বেশ ঠাণ্ডা। এটুকু পার হয়ে ওপারে যেতে হবে।

পিনাকীদা বললেন, আমি ওদিক দিয়ে ঘুরে যাব। বৌদি বললেন, ওদিক থেকে ঘুরে যেতে অনেক সময় লাগবে। তার মধ্যে যদি সাধুজি চলে যান। চল না জলে হেঁটে, ভয়ের তো কিছু নেই। ঠাণ্ডা তো লাগবেই পাহাড়ি জায়গায়।

বন্ধুর পার্বত্যপথে চলতে চলতে পর্বত-অরণ্যের শোভায় ডুবে যেতে চান পিনাকীদা। সাধুসঙ্গ নিয়ে তাঁর কোনও ব্যস্ততা নেই, নেই কোনও কৌতূহল।

অবশেষে পিনাকীদাকে নিয়ে নর্মদা বক্ষে নামলাম। এই প্রথম আমরা নর্মদাকে স্পর্শ করলাম। নর্মদা-মাঈ-কী জয় বলে সকলে চিৎকার করে উঠলাম। ধীরে ধীরে ঝির-ঝির করে বয়ে যাওয়া নর্মদার অন্যপারে কিছুটা সমতলে পৌঁছলাম। এই সেই চক্রতীর্থ।

শ্মশানের কাছে বিশেষ লোকজন নেই। একজন সাধু বসে আছেন ধ্যানস্থ অবস্থায়। যাঁর কথা শুনছি, তিনি এই সাধু কিনা জানি না। তাঁর থেকে একটু দূরে ধুনী জ্বলছে।

বেশ খানিকটা দূরে সাধুর সামনে বসলাম। পিনাকীদা আমাদের কাছে দাঁড়িয়ে দূরে পাহাড়ের দিকে দৃষ্টি দিলেন।

ভালো করে তাকালাম সাধুর দিকে। বয়স ঠিক বোঝা যায় না; তবে ষাট অনেকদিন ফেলে এসেছেন। দীর্ঘ দেহী। সামান্য জটা আছে। দাঁড়ি-গোঁফ সাদা-কালো। একটা নেংটির মতো কাপড় কোমরে জড়ানো। সারা গায়ে কাপড় নেই। রঙটা বেশ উজ্জ্বল। চেহারা এমন যে, পাঁজরার প্রতিটি হাড় গোনা যায়।

হাত-আটেক লম্বা আর হাত পাঁচেক চওড়া একটা ত্রিপল সাময়িকভাবে কেউ টাঙিয়ে দিয়েছে। একটু দূরে আর একজন কম বয়সী সাধু মাটির উপর বসে কী একটা বই পড়ছেন। পরে জেনেছি এই তরুণ সন্ন্যাসী ওই সাধুবাবার চেলা— নর্মদা পরিক্রমার সঙ্গী। প্রায় দু'বছর বাবার সঙ্গে আছেন।

বেশ অনেকক্ষণ পরে বাবা চোখ খুললেন। সকলের দিকে একবার তাকালেন। আমরা সকলে মাথা নিচু করে প্রণাম করলাম। তিনি পরিষ্কার বাংলায় কথা বললেন, এখানে কী মনে করে?

রমা বৌদি প্রথমে মুখ খুললেন, আপনাকে দেখতে বাবা। নর্মদাতীর্থে আপনার মতো সাধুদর্শন ভাগ্যের কথা। অনেক পুণ্য থাকলে হয়।

সাধু বিগলিত হলেন না, বিচলিতও হলেন না। বললেন, সবই ঠিক। কিন্তু সকলে সাধুদের কাছে কিছু চাইতে আসে। তোমাদেরও নিশ্চয়ই কিছু চাইবার আছে। বলেই চুপ করে গেলেন। শব্দগুলি এত গুরুগম্ভীর যে সমস্ত অঞ্চলটা যেন গম্‌গম্‌ করতে লাগল।

আমি উশখুশ করছিলাম কিছু বলব বলে। এমন সময় পিনাকীদা আরম্ভ করলেন, যা আমরা আদৌ ভাবিনি। বললেন, বাবা, আমরা সংসারের দহন জ্বালায় জ্বলছি। তাই যদি কিছু চাওয়ার থাকে, তা আপনাদের কাছে অতি সামান্যই। তবে তীর্থের কথা সরাসরি আপনাদের মুখে শুনতে চাই। তাতে হয়তো আমাদের একটু-আধটু ভক্তি জাগতে পারে। আমরা তাই শুনতে আপনার কাছে এসেছি।

সাধু একদৃষ্টিতে পিনাকীদার দিকে তাকিয়ে রইলেন। অনেকক্ষণ পরে তাঁর মুখে এক রহস্যময় হাসি দেখা গেল।

আমি একটা কথা বলব বলে ভাবছি। পাশে তপনও যেন কিছু বলতে চাইল। হঠাৎ যেন আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল— বাবা, আমি অনেকদিন ধরে এখানে একটা যন্ত্রণায় ভুগছি। জামাটা তুলে বুকের বামদিকে তলা থেকে বাম দিকের কোমর পর্যন্ত দেখালাম।

কথাটা বলে আমি যেন থমকে গেলাম। আমার ডাক্তারসঙ্গীরা বোধহয় আদৌ ভাবেননি এ ধরনের একটা কথা প্রথম

পরিচয়েই সাধুকে আমি বলব।

সাধু সঙ্গে সঙ্গে বললো, ওই ধুনী থেকে একটু ভস্ম নিয়ে আয়।

আমি তাঁর নির্দেশমতো ধুনী থেকে একটু ভস্ম নিয়ে এলাম। সাধু সেই ভস্ম বৃদ্ধাঙ্গুলি আর মধ্যমা দিয়ে ধরে যে জায়গায় যন্ত্রণা দেখিয়েছিলাম, সেখানে লম্বা করে ঘষে দিলেন। বললেন, যা বেটা, তোর যন্ত্রণা আজ থেকে সেরে গেল।

রমা বৌদি কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। সাধু তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন,মা, আমাদের একদিন খাবারের ব্যবস্থা কর।

'একদিন' কথাটার মানে আমরা কিছু বুঝতে পারলাম না। বৌদি, মনে হলো, সাধুর প্রস্তাবে থমকে গেলেন। কিন্তু অল্প সময়ে সে অবস্থা কাটিয়ে উঠে বললেন, বাবা, সে তো আমার পরম সৌভাগ্য। আমি কাল সব ব্যবস্থা করব।

সাধু আবার গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, কাল? তুই কাল বিশ্বাস করিস? কাল কথাটা আর সময়টা বড়ো খারাপ। যা করতে হবে সব আজই করতে হবে, এখনি করতে হবে।

—কিন্তু বাবা—

বৌদিকে কথা বলতে না দিয়ে শান্তভাবে সাধু বললেন, নর্মদা মাকে ডাকতে ডাকতে ওখান থেকে স্নান করে আয়।

হাত তুলে যে জায়গাটা দেখালেন, সেখানে একটু জল বেশি। প্রায় হাঁটু খানেক। জলের স্রোতটাও কম নয়।

বৌদি মন্ত্র মুগ্ধের মতো উঠে গেলেন। আমাদের দিকে তাকালেন না, কারোর সঙ্গে কথা বললেন না। ধীরে ধীরে সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে— বসে স্নান করলেন। মাথায় ভালো করে জল দিলেন। ভিজে কাপড়ে উঠে এসে সাধুর সামনে হাতজোড় করে দাঁড়ালেন।

তখন প্রায় বারোটা বাজে। সূর্যের তাপ ও আলো দুটোই প্রখর। স্নান করে ভিজে কাপড়ে থাকার অস্বস্তি একটা একটু করে কমে যেতে লাগল। এখানে চেষ্টা করলেও তাঁর উপযোগী কাপড় আমরা যোগাড় করতে পারব না।

—মা, এবার মন দিয়ে রাঁধ দেখি। সকলের বেশ খিদে পেয়েছে।

সাধু তার ঝুলি থেকে আধকাপের মতো চাল এবং একমুঠো ডাল বার করলেন। একটা ছোটো মাটির হাঁড়ি দিলেন।

রমাবৌদির তখন করুণ অবস্থা। এক পাগল সাধুর হাতে পড়ে আজ চূড়ান্ত দুর্ভোগ আছে। কথাটা ভেবে তিনি বেশ শঙ্কিত হলেন মনে মনে। কিন্তু সে ভাবটা বাইরে আদৌ বুঝতে দিলেন না। তিনি নর্মদা মায়ের নাম করে চাল-ডাল ধুয়ে ধুনীর কাছে কাঠ দিয়ে উনুন জ্বেলে দিলেন এবং হাঁড়ি চাপিয়ে দিলেন।

তপন পাথর দিয়ে উনুন তৈরি করতে প্রথমে একটু হাত লাগাল।

সাধুর নির্দেশমতো আমরা সাতজনের উপযোগী শালপাতা আশেপাশে থেকে জোগাড় করে আনলাম। আমাদের সঙ্গে মাত্র দুটো বোতল ছিল। নদী থেকে জল ভরে আনলাম।

সাধু ভাতের হাঁড়িটা বাম হাতের তিন আঙুলে বসালেন। হাঁড়ি থেকে একটি ভাত নিয়ে মাতা নর্মদাকে নিবেদন করলেন। আর একটি ভাত নিয়ে নিজে সেবা করলেন। তারপর হাঁড়িটা মাটিতে রেখে বৌদিকে বললেন, দে সকলকে খেতে দে।

আমরা যথারীতি পাতা পেতে বসে আছি।

আমার খুব খিদে পেয়েছিল। দেখলাম বৌদি হাঁড়িটা হাতে নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন। বললাম, যা আছে তাই দাও না।

বৌদি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাঁড়িটা উপুড় করে সব ভাত আমার পাতে ঢেলে দিলেন। আমি একবার বৌদির দিকে, একবার সাধুর দিকে তাকাচ্ছি। হাঁড়িটা মাটিতে রেখে বৌদি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন।

সাধু অন্যদের দিকে তাকিয়ে বললেন, ওদের দে।

—হাঁড়িতে আর ভাত কই? অনেকটা কান্নার মতো শোনাল বৌদির কথাগুলো। সাধু স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন বৌদির বিষণ্ণ মুখের দিকে; বললেন, এই তোর মনের জোর? এতটুকু বিশ্বাস করতে পারলি না? নে, হাঁড়িটা হাতে তুলে নে। প্রত্যেকের পাতে হাতে করে তুলে দে।

হাঁড়িটা হাতে তুলে বৌদি অবাক। হাঁড়ি ভর্তি ভাত। তিনি নর্মদা মায়ের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে পরিবেশন শুরু করলেন। হাঁড়ির ভাত সব সময় পূর্ণ থাকল। আমরা প্রত্যেকেই একাধিকবার নিলাম। সেদিন কত ভাত খেলাম নিজেরই জানিনা। তেল-মশলা ছাড়া খিচুড়ি যে এত স্বাদু হয়, না খেলে বুঝতে পারতাম না।

সকলের খাওয়া হয়ে গেলে সাধু বৌদিকে বললেন, তুই যতটা খাবি তোর শালপাতায় একেবারে তুলে নে। হাঁড়িটা একধারে রেখে দে।

বৌদির চোখদুটো ছলছল করছে। না, অক্ষমতা আর লজ্জায় নয়; এক অপূর্ব আনন্দে। বিজ্ঞানের কৃতী ছাত্রী ও নামী চিকিৎসক রমা ভট্টাচার্যের কাছে এর ব্যাখ্যা খোঁজা তখন হাস্যকর মনে হলো।

খাওয়ার পর পিনাকীদা কেমন আচ্ছন্ন অবস্থায় পৌঁছে গেলেন। চোখের সামনে যা ঘটল, অন্য কেউ তা বললে, তিনি তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতেন। কিন্তু নিজের চোখে...পেটে...

তিনি নর্মদা প্রসঙ্গে অনেক প্রশ্ন করলেন সাধুকে। আমরাও কিছু কিছু প্রশ্ন করলাম। তিনি পরিষ্কার বাংলা বললেও মাঝে মাঝে দু'একটা ইংরেজি ও হিন্দি শব্দ মিশে যাচ্ছিল।

শেষের দিকে পিনাকীদা ছোটো একটা নিবেদন করলেন অতি বিনয়ের সঙ্গে এবং ইংরেজিতে—Would you please tell us something of your past life?

সাধু তাকালেন পিনাকীদার মুখের দিকে। কিছুক্ষণ কী যেন ভাবলেন এবং সংক্ষেপে তাঁর অতীতের কিছু অংশ মেলে ধরলেন, যদিও তিনি প্রথমে বললেন, সন্ন্যাসীর পূর্বাশ্রমের কথা বলা ঠিক নয়। বললেন একেবারে নির্ভেজাল ইংরেজিতে এবং যথাযথ উচ্চারণ রীতিতে। আমরা যতক্ষণ ছিলাম, আর একটা কথাও বাংলা বা হিন্দিতে বলেননি। জানা গেল—

সাধুজী গোটা তিনেক এম এ পাশ। উত্তরপ্রদেশের এক কলেজে অধ্যাপনা করতেন। ছেলে আমেরিকায় ডাক্তার। মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন দিল্লিতে এক বড়ো ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে। তিনি আজ দশ বছর নর্মদা পরিক্রমা করছেন। তাঁর অন্তিম ইচ্ছা মাতা নর্মদার কোলে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবেন।

পরদিন আবার আসব বলে বিদায় নিলাম প্রায় দুটোর কাছাকাছি। ততক্ষণ বৌদি চাদর-টাদর গায়ে দিলেও ভিজে শাড়িতেই ছিলেন। একবারও তা নিয়ে তাঁকে বিচলিত হতে দেখিনি। বুঝলাম, তাঁর মনে সত্যি জোর ও বিশ্বাস আছে।

পিনাকীদা স্থির করলেন পরদিন 'বাবা'-র জন্য অনেক খাবার নিয়ে যাবেন। সমস্ত খরচ তিনি একাই বহন করবেন। কুড়ি কিলো চাল, দশ কিলো ডাল, সেই সঙ্গে আলু-সবজি-তেল-ঘি ইত্যাদি। ভালো ফল, মিষ্টি, ধূপও কেনা হলো।

গতকাল যেখান থেকে পার হয়েছিলাম, সেখান দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছি। ঝিরঝির করে জল বয়ে চলেছে। নানা ধরনের ছোটো বড়ো পাথরের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। জলের বেগ যথেষ্ট নয়। তবে অন্যমনস্ক হলে পড়ে যাবার

সম্ভাবনা আছে। প্রত্যেকের হাতে কিছু না কিছু জিনিস আছে বাবাকে দেওয়ার জন্য। এক একটা প্যাকেট। আর ফুট দশেক গেলে ওপারে পৌঁছে যাব। আর সেই সময় পিনাকীদা একেবারে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন। হাতে ছিল ধূপ আর মিষ্টির একটা বড়ো ঠোঙা। তাঁর হাতের জিনিসগুলি এমনভাবে ভেসে গেল আমরা চেষ্টা করলেও সেগুলো উদ্ধার করতে পারতাম না। সামান্য কিছু উদ্ধার করলেও কোনও কাজে লাগত না। ধূপ জলে ভিজে ভেসে যাচ্ছে। মিষ্টির ঠোঙা ছিঁড়ে গেছে, আর মিষ্টিও ভেসে যাচ্ছে বা পাথরের ভাঁজে ঢুকে যাচ্ছে।

একেবারে শূন্য হাতে প্রায় আধ ভেজা জামাকাপড় নিয়ে পিনাকীদা উপরে উঠলেন। বৌদিসহ আমরা ছ'জন নিরাপদে উপরে উঠলাম আমাদের সব জিনিস ঠিকমতো হাতে নিয়ে।

চক্রতীর্থে বাবার আসনের কাছে গেলাম। বাবা নেই, তাঁর চেলাও নেই। কাল যে ত্রিপলের চালটা ছিল, সেটাও দেখা যাচ্ছে না।

অত্যন্ত আশাভঙ্গ হলো পিনাকীদার। আমাদের মনটাও খারাপ হয়ে গেল।

বাবার আসনের পাশে একটা চালামতো ছিল। সেখানে সমস্ত জিনিস রেখে দিলাম। যেরকম প্যাকেট এনেছিলাম, সেইভাবে গুছিয়ে রাখলাম। সাধু-সন্তদের যদি কাজে না লাগে, তবে অন্য কারোর কাজে লাগবে। তীর্থে দান তো বড়ো পুণ্যের কাজ।

আজ হলিডে হোমে খাবারের অর্ডার দিইনি। সাধুসঙ্গ করে আশেপাশে কোথাও খেয়ে নেব ভেবেছিলাম। কিন্তু সাধুসঙ্গ না পাওয়ায় সময় প্রচুর। অতএব এখন চক্রতীর্থের আশেপাশে ও কপিলধারায় ঘুরব। দূরে যাবার পরিকল্পনা করা আছে কাল থেকে।

আমি, তপন আর উমাপদ গেলাম একদিকে। পিনাকীদার-নেতৃত্বে অন্যরা গেল অন্যদিকে।

ঘুরতে ঘুরতে কপিলধারায় এলাম। প্রায় অলক্ষ্যে এসে নর্মদা এখানে আছড়ে পড়েছে প্রায় দু-হাজার ফুট নিচে। তার শব্দও কম নয়। সত্যই নয়নলোভন। প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে ছিলাম জলপ্রপাতের ধারে। পণ্ডিত নেহেরুর চিতাভস্ম এখানেও বিসর্জিত হয়। সেই স্মৃতিতে নেহেরু চবুতরা নামে এর প্রসিদ্ধি আছে।

অন্যদিকে যাব বলে সেখান থেকে উঠছি। হঠাৎ আমাদের সামনে বাবা। বাবাকে মাথা নিচু করে প্রণাম করলাম।

আমাদের দিকে বাবা রহস্যময় হাসিতে তাকালেন; বললেন, কী বুঝলে বল দেখি। কিছুক্ষণ চুপ করে আবার শুরু করলেন, ঘাড় ধরে মায়ের কোলে ফেলে দিলুম। উনি আমার খাবারের ব্যবস্থা করছেন! আরে বাবা, এখানে কত গরিব, ভিখিরি, তাদের খাবারের ব্যবস্থা করে দে না। তা না করে...যত সব...

চমকে উঠলাম বাবার কথা শুনে। উনি সবই জেনেছেন দেখছি। কি অদ্ভুতভাবে একটা মানুষের দম্ভ তিনি চূর্ণ করলেন। জানি না, যাকে তিনি বোঝাতে চাইলেন, তিনি বুঝেছেন কিনা।

এবার আমি বললাম, বাবা, আপনাকে দর্শনের সৌভাগ্য আর কোনওদিন হবে কিনা জানি না। একটি প্রার্থনা— আপনার একটা ফোটো চাই। আজ তো ক্যামেরা আনতে ভুলে গেছি। তাই...

বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে আর কথা বলতে পারলাম না।

তিনি আমার দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে আছেন। মনে হচ্ছে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে আমার হৃদয়ের গভীরে চলে গেছেন। কিছুক্ষণ পর বললেন, আমার ফটো যদি চাস, সময় মতো পাবি। এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি তপন। এখন সে কিছু বলার জন্য মুখ খুলল, বাবা...

বাবা তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, হ্যাঁ, জানি তোর যন্ত্রণা কোথায়। আজ দু-দিন ধরে চেষ্টা করছিস আমাকে কিছু বলার জন্য। কিছুতেই জোর পাচ্ছিস না। তোর পঙ্গু মেয়ে আর কোনওদিন হাঁটতে পারবে কিনা, তাইতো? তুই ডাক্তার বলে তোর কষ্ট আরও বেশি— নিজের মেয়ের জন্য ডাক্তার হয়ে কিছু করতে পারলাম না। যা, বাড়ি যা, নর্মদা মা ও শিবসুন্দরকে পুজো দিয়ে। বাড়ি গিয়ে দেখবি, মায়ের কৃপায় তোর মেয়ে হেঁটে হেঁটে এসে দরজা খুলে দেবে।

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে তপন যেন আরও কিছু বলার চেষ্টা করল। কিন্তু তার মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বেরোল না। বাবা বললেন, হ্যাঁ, তোর বিশ্বাস ও ভক্তি এদের কারও চেয়ে কম নয়। মনেপ্রাণে আমার একটা ছবি চাইছিস। আমি সময়মতো তোকে ছবি পাঠিয়ে দেব।

সাতদিনের এমনসূচি ছিল। কিন্তু পঞ্চম দিনে তপনকে নিয়ে আমার চলে আসতে হলো। বেচারা একা বাড়িতে ঢুকে কী দেখবে, এই উত্তেজনা আর অস্বস্তির মধ্যে কাটাচ্ছিল বাবার আশীর্বাদ পাবার পর।

অবশেষে নর্মদা ও নর্মদেশ্বরকে প্রণাম করে ফিরলাম কলকাতার পথে। আমাকে ছাড়া সে বাড়িতে ঢুকতে চাচ্ছে না। তাই বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে।

প্রায় দশটা বাজে। কড়া নেড়ে ডাকলুম—পুতুল, পুতুল।

অপ্রত্যাশিত এই সময়ে এই ডাকে বাড়ির সকলে একটু চমকে উঠল।

দরজা খুলে গেল। পুতুল সামনে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পেছনে তার মা।

'বাপি', 'বাপি', বলে দু-পায়ে এগিয়ে এসে পুতুল ঝাঁপিয়ে পড়ল তপনের বুকে।

(অঙ্কন : রমাপ্রসাদ দত্ত)

গল্প

স্বপ্নে আমার মিতা

তারক সাহা

আমার নাম রঞ্জন। মানে রঞ্জন দাশ। ছা-পোষা কেরাণী। প্রথম জীবনে আমার প্রেয়সী সুমনা আমাকে 'রঞ্জু' বলে ডাকত। পিতৃ দত্ত নামের অপভ্রংশ আর কি! অন্য আর কেউ এই নামে ডাকে না। বেশ একটা শিহরন লাগত। সুমনা আমার জীবনে আর নেই। আমার মায়া ছেড়ে বহুদূরে, একেবারে নাগালের বাইরে চলে গেছে ও। বাবা, মায়ের একমাত্র সন্তান সুমনা। ওর বাবা মায়ের বেশ পয়সা ছিল। বাবা বড় ব্যবসায়ী। একদিন সুমনা এসে বলল, 'রঞ্জু, আমরা কেদার-বদ্রী যাব'।

—'আমরা মানে?'

—বাবা, মা আর আমি।

আমি কেদার বদ্রী ঘুরে এসেছি। বেশ কঠিন রাস্তা। সাপের মতো রাস্তা। লম্বা জার্নি।

—তুমি পারবে? আমি শুধাই। বললাম, বাসে দু' ঘণ্টার জার্নিতে তো ওয়াক ওয়াক কর। টানা বারো ঘণ্টার রাস্তা যেতে পারবে তো?

আমার গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'আলবৎ পারব। তুমি সঙ্গে থাকলে বেশ মজা লাগত। যাবে আমাদের সঙ্গে'?

—'ক্ষেপেছ? অত লম্বা জার্নি আমার আর সইবে না। কিন্তু মিতা জানো আমার খুব ভয় করছে। পাহাড়ী রাস্তা, প্রায়ই কত দুর্ঘটনা ঘটে ওইসব রাস্তায়। তুমি যেয়ো না কেমন। পনের দিন আমি খুব মিস করব।

—ইস! আমার ভালবাসার মানুষ রে! ভালই তো তুমি আবার বিয়ে করবে, আমি মরে গেলে।

—ছিঃ, এ কথা বলতে নেই মিতা। প্রমিস, আমি কাউকে বিয়ে করব না তোমাকে ছাড়া।

—আচ্ছা, দেখব বাবা দেখব। মরে গেলে ওপর থেকে তোমার ওপর নজর রাখব। বুঝলে আমার হবু বর!

মিতা বা সুমনা-র এসব মেয়েলি কথা আমার বেশ ভাল লাগে। সব মেয়েরা এধরনের কথা বলে। এগুলি মেয়েদের ফর্মুলা। সব মেয়েরাই এমন কথা তাদের প্রেমিকদের বলে থাকে। তবুও যেন আমার ভাল লাগল, আবার কেমন ভয়ও পেলাম আমি। রুটিন মাফিক বললাম, 'যাচ্ছ যাও, ভালভাবে যেও। সবসময় ফোন করবে'।

—'আচ্ছা বাবা, আচ্ছা। এখন তো বাবা মায়ের সঙ্গে যাচ্ছি, তাঁরাই আমায় দেখবেন। বিয়ের পর তুমি যখন হমিমুনে নিয়ে যাবে তখন আমি নিজেকে তোমার হাতে সঁপে দেব'।

কথাগুলো যখন বলছে সুমনা, লক্ষ্য করলাম ওর চোখ দুটো ছল ছল করছে। ভাবলাম ওদের সঙ্গে গেলে ভাল করতাম। আমাদের ভালবাসায় সুমনার বাবা-মার কোনও আপত্তি ছিল না। ওঁদের বাড়ী গেলে ওঁর আমাকে নিজের ছেলের মতো আদর-যত্ন করতেন। আজ সুমনা পাশে নেই। ওর স্মৃতি আজও আমার তাড়া করে। ওর সঙ্গে কত বাদাম ভাজা খেয়েছি মিলেনিয়াম পার্কে। নিজের পয়সা খরচ করে সুমনা আমাকে সিনেমা দেখিয়েছে। সুমনা ফুচকা খুব ভালবাসত। ওকে ফুচকা খাইয়ে আমি খুব তৃপ্ত হতাম। সুমনা আমাকে আনন্দ আশ্রম সিনেমা দেখিয়েছিল। ও স্বপ্ন দেখত আমি ওকে অতটাই ভালবাসি, যতটা সিনেমায় উত্তম ভালবাসত শর্মিলাকে।

২

সেদিন ছিল বুধবার। সুমনা, ওর বাবা আর মা উপাসনা এক্সপ্রেসে হরিদ্বারে রওনা দিল। সেটাই ছিল সুমনা বা মিতার সঙ্গে শেষ দেখা। হাওড়া স্টেশনে আমি পৌঁছে দিতে গেছিলাম ওদের। মিতার মা সুছন্দা আমাকে বললেন, 'ভাল থেক। আমাদের ফোন করবে কিন্তু'।

—'নিশ্চয় করব মাসিমা। মিতা তুমিও তোমাদের ভ্রমণের বৃত্তান্ত জানাবে। রোজ রাতে শোবার আগে কেমন!'

ট্রেন ছেড়ে দিল। এসি-র কামরা থেকে দৃশ্যের বাইরে চলে যাবার আগে পর্যন্ত মিতা হাত নাড়তে থাকল দরজায় দাঁড়িয়ে।

হরিদ্বার পৌঁছে মিতা আমাকে ফোন করল। শনিবার ওরা মুসৌরী, দেরাদুন গেছিল। মুসৌরীতে

আমি একরাত থাকলেও ওরা সকালে গিয়ে রাতে ফিরে এলো। 'কেমটি ফলস' ওর খুব ভাল লেগেছে। আমারও তাই। হরিদ্বারে ওরা অলোকানন্দা হোটেলে ছিল। পাশ দিয়ে কলকল তালে বয়ে যাচ্ছে অলোকানন্দা। গঙ্গার-ই পাহাড়ী নাম। মিতা ফোন করে হরিদ্বারের, ঋষিকেশের ঝুলন্ত সেতু আরও কত কী ফোনে জানাত। আমি বলতাম, 'ফিরে এসে ভ্রমণ নিয়ে একটা বই লিখে ফেলো কেমন। ভাল বিকোবে।' খিল খিল করে হাসত দুষ্টু মেয়েটা। ফোন করলে কিছুতেই ছাড়ত না।

সোমবার, সপ্তাহের প্রথমদিন ওরা রওনা দিল। আমি বলেছিলাম কেদার যাওয়ার আগে রুদ্র প্রয়াগে হল্ট করতে হয় রাতটা। পরদিন ফের চলা কেদারের পথে। রুদ্র প্রয়াগ থেকেও ফোন করেছিল মিতা। রুদ্র প্রয়াগ থেকে গৌরীকুণ্ড যাওয়ার পথে ব্যাপক বৃষ্টি। সেই বৃষ্টিতে ধস এসে নামল ওদের গাড়ীতে। মিতাকে নিয়ে জীবন গড়ার স্বপ্ন ওদের গাড়ীর মতো গুঁড়িয়ে দিয়ে তিন শ' মিটার গভীর খাদে ফেলে দিল। শুনেছি অত বৃষ্টিতে বেরোতে চায়নি গাড়ীর চালক। কিন্তু মিতার আর ওর বাবা অবনীবাবুর জেদাজেদিতে গাড়ীর চালক বাধ্য হয় কেদারের দিকে যেতে।

৩

টি ভি চ্যানেলের খবরে মিতাদের মৃত্যুসংবাদ পাই। বুকে একটা চাপা ব্যথা অনুভব করলাম। মিতা আমাকে খুব ভালবাসত, আমিও। ঈশ্বর বোধহয় এমনই এক বিয়োগান্তক নাটক লিখে রেখেছিলেন আমার নসিবে। চোখ ফেটে জল আসছিল। শোকে বিহ্বল হয়ে পড়লাম। উত্তরাখণ্ড থেকে কফিনে ওদের মৃতদেহ এল প্রায় এক সপ্তাহ বাদে। অবনীবাবুর ভাই ধরণীবাবুরা মৃতদেহ গ্রহণ করল। আমার বিশেষ পরিচয় নেই ওদের সঙ্গে। মিতা যে আমার প্রেমিক ধরণীবাবুর পরিবার সেটা জানলেও এবার আমাকে পাত্তাই দিল না। ওরা আমার সঙ্গে এমনভাবে ব্যবহার করল যে, আমি মিতাকে শেষ দেখাও দেখতে পেলাম না। ধরণীবাবুরা একবারের জন্যও ওদের বাড়ী ডাকলো না। আমার অভিমান হলো। মেয়েটাই যখন নেই তখন আর কী লাভ। ইচ্ছে ছিল তিনটে মালা কিনে কফিনের ওপর চড়াই। কিন্তু কাছেই ঘেঁষতে দিল না আমায়। অলক্ষ্যে রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে ফিরে এলাম।

৪

দু' বছরেরও বেশি কেটে গেল মিতা আমার মধ্যে নেই। মিতাকে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম জীবনে বিয়ে করব না। কিন্তু এর মধ্যে বেশ খানিকটা পরিবর্তন ঘটে গেল আমার জীবনে। আমরা দুই ভাই। দাদা অঞ্জন বিয়ে করে মাকে আমার জিম্মায় রেখে পুনেতে চলে গিয়েছে কী একটা হোটেলে চাকরি নিয়ে। ছোট বেলায় মার হাতে সঁপে বাবা বিদায় নিয়ে উধাও হয়ে গিয়েছিলেন। কেউ বলে সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন কেউ বা বলে মারা গেছেন। বারো বছর অপেক্ষা করে মা এখন বিধবার বেশভূষা পরেন। তা আমার শেষ সহায় মাও আমাদের ছেড়ে অনাথ করে গেলেন। আমি একা। মিতার মৃত্যুসংবাদ শুনে মা মুষড়ে পড়েছিলেন। মার আশা ছিল মিতার হাতে আমাকে সঁপে নিশ্চিন্তে চলে যাবেন। তেমন ভাগ্য মা বা আমার কারুরই নেই।

ব্লু স্কাই ফিনান্সে আমার চাকরিটা জুটিয়ে দিয়েছিল আমার বন্ধু অনির্বাণ। অনির্বাণ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেট। বরাবরই পড়াশুনায় ভাল। অনির্বাণের সঙ্গে আমাদের সংস্থার মালিক প্রমথেশ বড়ুয়ার বেশ খাতির। একসঙ্গে ওঠাবসা। মদের গেলাসের বন্ধু। ব্লু স্কাই ফিনান্স বেশ বড় কোম্পানী। দেশের সব বড় বড় শহরে এদের অফিস। পাঁচ হাজার কোটি টাকার কোম্পানী। শেয়ার বাজারে মিড ক্যাপ কোম্পানী।

মা চলে যাবার পর কার্যত অনাথ আমি। হাত পুড়িয়ে রান্না করে খেতে হচ্ছিল। সবেচেয়ে মুশকিল হলো রাতে বাড়ী ফিরে কী করব। অনুভব করলাম, নাহ্ জীবনে একটা নারীর প্রয়োজন। মাঝে মধ্যে মনে হোত বিয়ে করলে মিতাকে দেওয়া প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না তো? আবার মনে হোত যদি ঘটনাটা আমার ক্ষেত্রে হোত তাহলে কি মিতা বিয়ে করত না? নিশ্চয় করত। কোনও মেয়ের বাবা-মা তাদের কন্যাসন্তানকে বিয়ে না দিয়ে শান্তিতে মরতে পারে না। তাহলে আমি-ই বা অকৃতদার কেন থাকব? এসব প্রতিজ্ঞা-টতিজ্ঞা সিনেমা, গল্প-উপন্যাসে ঘটে। বাস্তবে এর মূল্য কি?

তাই সিদ্ধান্ত নিলাম বিয়ে করবই। মনে মনে মিতাকে স্মরণ করে বললাম, 'তুমি তো চলে গেছ আমাকে একা ফেলে। মাও নেই। কী করব বল মিতা? রাগ করো না প্লীজ। আমিতো স্বপ্ন দেখেছিলাম তোমাকে নিয়ে সুন্দর সংসার গড়ব। সেখানে তুমি আমি আর ফুটফুটে আমাদের এক সন্তান। বিধাতা সইল না আমার কপালে এত সুখ!'

আমার কষ্ট দেখে আমার এক সহকর্মী সুজয় বলল, 'রঞ্জন, তুমি আর কতকাল এইভাবে কাটাবে। বিয়ে শাদী করবে না? আমাদের পাড়ায় একটি মেয়ে আছে, ইস্কুলে সে পড়ায়। দেখতে পার। আমি তোমার সম্পর্কে বলেছি। ওরা রাজি'।

অগত্যা রাজি হলাম। প্রাইভেট কোম্পানীতে চাকরি। কোম্পানী মাইনে বাড়াচ্ছে না বেশ কয়েক বছর। মাইনে বাড়াবার কথা বললে সবসময় কোম্পানীর লোকসানের কথা বলে। অথচ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বড় বড় অফিস করছে। ডিরেক্টরদের দামী গাড়ি। মাইনে বাড়াবার কথা বললেই কোম্পানীর জবাব, 'না পোষালে, অন্য চাকরি দেখ'। চাকরি যাবার ভয়ে আমরা সবাই জু জু হয়ে আছি ভয়ে। তাই কপালে যদি একটা রোজগারে গিন্নি জোটে তবে ক্ষতি কী! এই দুর্মূল্যের বাজারে চার হাতের রোজগার না হলে সংসার চালানোই মুশকিল। তাই রাজি হয়ে গেলাম।

৫

মেয়েটার নাম মলি। ভাল নাম মল্লিকা। বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান। বাবা অঙ্গনওয়াড়ির কর্মী। মেয়ে মল্লিকা পাড়ার এক ইংরেজী মাধ্যম স্কুলের শিক্ষিকা। এখন বেতন কম। কথা চলছে আই সি এস ই-র মনোনয়ন পেলে গ্রেড চালু হয়ে যাবে আর তখন মাইনে-পত্তর ভাল হবার আশা।

মল্লিকা দেখতে শুনতে ভাল। সুজয়দের পাড়ায় ওদের ছোট্ট একতলা বাড়ী। সরকারী কর্মী ছোট-খাটো চাকুরেদের এর থেকে বড় বাড়ী হয় না। দু'কামরা বাড়ী। রান্নাঘর, একটা ল্যাটট্রিন, একটা খাবার জায়গা রয়েছে। জমি দু' কাঠা থাকলেও দেড় কাঠার ওপর ছিম-ছাম বাড়ী। বাকী আধ কাঠায় রয়েছে ছোট্ট বাগান। তাতে আমগাছ, টগর ফুল গাছ, জবা ফুল গাছ, এছাড়া অনেক রকম ফল, সবজির গাছ রয়েছে।

মল্লিকার গায়ের রং ফর্সা। নাক টিকালো। কালো চুল, পাঁচ ফুটের মতো লম্বা। আমার সঙ্গে বেশ মানানসই। আমি জানিয়ে দিলাম আমার পছন্দের কথা। তবে মল্লিকার সঙ্গে মিতার তফাৎ অনেক। মল্লিকা ধীর, স্থির। মিতা ছিল অনেকটা ডানপিটে। মিতা ঘোড়ায় চড়তে পারত, গাড়ী চালাত। মিতা মল্লিকার মতো লম্বা। তবে ওর গায়ের রংটা ছিল চাপা। নাকটা একটু মোটা। চুলগুলি কোঁকড়া। মিতা প্যান্ট, শার্ট ছাড়া কিছু পরত না। মিতাকে মা পছন্দ করত না। ওর এই ডানপিটে স্বভাবের জন্য। মা পুরোন দিনের মানুষ। মল্লিকাকে দেখলে মা আলবাৎ পছন্দ করত এটা আমি নিশ্চিত। মিতার সঙ্গে বিয়ে হলে বনিবনা হোত না নির্ঘাত। যাইহোক ভগবানের ইচ্ছায় দুনিয়া চলছে। চলুক।

৬

মল্লিকার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেল। অনাড়ম্বর বিয়ে। হৈ চৈ, হুল্লোড় করার মতো কেউ নেই আমাদের। দাদাকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম আসেনি। অফিসের সহকর্মীরাই আমার আত্মীয়-স্বজন। ওরা খুব খেটেখুটে আমার বিয়েটা উৎরে ছিল।

আমাদের বিয়ের পর হনিমুনে দীঘায় গেলাম। আমাদের দুজনের রোজগারের যোগফল যা তা দিয়ে এই দুর্মূল্যের বাজারে দীঘা-শঙ্করপুর বা বড়জোর পুরী যাওয়া যেতে পারে। ওই মুহূর্তে আমার মিতার কথা মনে পড়ছিল। একদিন হঠাৎ ও প্রশ্ন করছিল—

—'বিয়ের পর আমরা কোথায় হনিমুনে যাব বল তো'?

—'কেন দীঘা বা পুরী'।

—ইস্, কীরকম যে গেঁয়ো তুমি। নজর সামনে রাখ। আমি ভেবেছিলাম তুমি বলবে বোম্বে-গোয়া, বা সিমলা-মানালী'।

—'অত পয়সা কোথায় পাব, আমার হবু বৌ'?

—'তোমার সব সময় হা-পিত্যেস। আমি বাবাকে বলে রেখেছি ব্যাংকক না হলে সিঙ্গাপুর। বাবা রাজি।'

মনে মনে ভাবতাম মিতা আমাকে ঋণের ফাঁদে জড়াতে চাইছে। তর্ক এড়িয়ে চুপ করে থাকতাম।

আমাদের কোম্পানী কর্মচারীদের বেতন বাড়ায় না। শুনেছি বড়ুয়া সাহেব বিয়ের পর ক্যারিবিয়ান আইল্যান্ড গিয়েছিলেন হনিমুনে পনের দিনের জন্য। অন্যান্য ডিরেক্টররা শুনেছি কেউ সুইজারল্যান্ড কেউ বা হংকং বা কানাডা কিংবা সিঙ্গাপুর। আমাদের মতো ছা'পোষা কেরানীগুলোর ওসব আকাশ-কুসুম ভেবে লাভ নেই। এতে মনের কষ্ট বাড়ে বই কমে না।

দীঘা-শঙ্করপুরে গিয়ে মল্লিকা খুব খুশী। নুলিয়াদের সঙ্গে সমুদ্রস্নানও খুব উপভোগ করল। আগে কোনদিনও সমুদ্র দেখেনি। সমুদ্রের ব্যাপ্তি, গভীরতায় মল্লিকা আপ্লুত।

হনিমুনের পরই মল্লিকার গর্ভ সঞ্চার হলো। এক বছরের মাথায় আমাদের মাঝে রণজয় এলো। 'রণজয়' নামটা ওর দাদুর দেওয়া। আমরা ওর নামটা ছোট্ট করে 'রন্টু' বলে ডাকতাম। রন্টু খুব ডগমগে। উচ্ছল, চাঞ্চল্যে ভরা। মা-র মতো দেখতে ওকে।

৭

আমাদের বেতন না বাড়লেও কাজের চাপ দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। 'বড়ুয়া টাওয়ারের' তিনটে ফ্লোর নিয়ে প্রায় আড়াই হাজার বর্গফুটের বিশাল অফিস। 'ব্লু স্কাই' নামে ফিনান্স ছাড়াও স্পাইস এক্সপোর্ট, ড্রাই ফিস এক্সপোর্ট, 'ইনফ্রাস্ট্রাচার' বিজনেশ চলে ওই অফিস থেকে। আমার মতো অঘামার্কা পাশ কমার্স গ্র্যাজুয়েট এই বেতনে পড়ে আছি। কিন্তু চন্দন, বুলা, সুপ্রিয়রা ভাল সুযোগ পেয়ে অন্যত্র চলে গেছে।

মার্চ মাস। আর্থিক বছরের শেষে বরাবরই রাতে ফিরতে দেরী হয়। রন্টু মাধ্যমিক দেবে। অনেক রাত অবধি ও পড়াশুনা করে। ফিরতে আমার দশটা-সাড়ে দশটা হয়ে যায়। খাবার নিয়ে ঠায় বসে থাকে মল্লিকা। মল্লিকা খুব ভাল মেয়ে। ওকে পেয়ে মিতার স্মৃতি ধীরে ধীরে মলিন হয়ে গেছে। আজকাল ওর মুখটা ঝাপসা মনে পড়ে। ওর ছবি আমার কাছে নেই। ওর কাছে অনেকদিন ছবি চেয়েছি। ও বলত, 'কাগজের ছবি দিয়ে কি হবে শুনি? আমার ছবি তো তোমার মনে গেঁথে রয়েছে, তাই না মাই ভেরি গুড হাজব্যান্ড?'।

মিতার কথাটা একদম ঠিক নয়। মনটা আজকাল বেইমানি করে প্রায় ভুলিয়েই দিয়েছে। কাগজের ছবি থাকলে অন্তত অ্যালবাম থেকে বের করে দেখতাম মাঝে মধ্যে। মল্লিকাকে দেখিয়ে বলতাম, 'দেখ, সি ইজ ফার্স্ট লেডি ইন মাই লাভ। আমি ওকে খু-উ-ব ভালবাসতাম। ও এত ভাল যে বিধাতা ওকে নিয়ে গেল নিজের কাছে'। আমি জানি মল্লিকা এতে রাগ করত না। পাস্ট নিয়েও ভাবে না। ওর মাছের চোখ আমার-রন্টুর ভবিষ্যৎ।

৮

৩০ মার্চ ফিরলাম আরেকটু দেরী করে। এগারোটা বেজে গেছে। এত ক্লান্ত খাওয়া দাওয়া সেরে সোজা বেড-রুমে শুতে গেলাম। রন্টু বড় হওয়ার পর মল্লিকা আমার সঙ্গে শোয় না। হাতের কাজ সেরে ও রন্টুর ঘরে গেল। আমি পাখা খুলে স্পীডে চালিয়ে দিলাম। চোখে ঘুম আসতে কেবল মুহূর্তের অপেক্ষা।

রাত তখন কটা জানি না। আমি রাতে খুব একটা স্বপ্ন-টপ্ন দেখি না। হঠাৎ স্বপ্নে হাজির সুমনা বা মিতা। হঠাৎ ও প্রশ্ন করলো,—'কেমন আছ'।

—'ভাল'।

—'শুনলাম তুমি বিয়ে করেছ'?

—'কে, বলল'।

—'দীপংকর'।

—'দীপংকর, মানে...'।

—'সেন, ও তো ক্যানসারে মরে এখানে এসেছে।'

—'তাই নাকি'!

—'সে খবরও রাখ না'।

—'সময় পাই না'।

—'এসব তোমার ন্যাকামো। তুমি আমার প্রশ্নের জবাব দিলে না'?

—'হ্যাঁ, বিয়ে করেছি'।

—'তোমার প্রতিজ্ঞার কী হলো'?

আমি কি কারণে বিয়ে করতে বাধ্য হলাম সবিস্তারে বললাম। কিন্তু ও মানলো না।

ও বলল, '—আমি এখানে ভীষণ একা। আসবে'?

—'আমি কী করে যাব মিতা। মল্লিকা আমার বউ, রন্টু আমার ছেলে। ওদের আমি ভীষণ ভালবাসি। তাছাড়া আমি তোমার ওখানে গেলে ওরা যে অনাথ হয়ে যাবে।'

—'তোমরা ছেলেরা এরকম। আমাদের বডি দেখে তুমি ফুঁস ফুঁস করে কেঁদেছিলে কেন? নাটক!'

—'আরে তা কেন হবে? তোমাদের মৃত্যুর পর আমি পাঁচ বছর বিয়ে করিনি যতদিন মা বেঁচে ছিলেন। আচ্ছা, তুমি বল তো ঘটনাটা যদি উল্টো হোত তবে কি তোমার বাবা-মা তোমার বিয়ে দিতেন না?'

—'আলবাৎ না। বাবা-মা চাইলেও তোমাকে ছাড়া আমি কাউকেই বিয়ে করতে পারতাম না। তোমরা ছেলেরা অন্যরকম। তোমরা সব পার। কেন, কোনও একটা মেয়ে মানুষকে দেখভালের জন্য রাখতে পারতে না বেতন দিয়ে?'

—'সেটা ভণ্ডামি হোত মিতা। তুমি তো অতীত। তোমাকে কোথায় পাব। তুমি বেঁচে থাকলে আমার তো এসবের কোনও দরকার-ই হোত না'।

—'ওসব আমি শুনতে চাই না। দু-চারদিনের মধ্যে তুমি আসবে কিনা বল। তোমাকে আসতেই হবে'।

—'মিতা শোন'।...কথাটা শেষ হতে না হতেই মিতা কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

পাখা পুরোদমে চলা সত্ত্বেও আমি দরদর করে ঘামতে লাগলাম। হার্ট অ্যাটাক হলে নাকি এমনতর হয়। তাহলে কি সত্যিই মিতা আমাকে শাসিয়ে গেল। আমি নাড়ী টিপলাম। আলো জ্বালিয়ে ঘড়ি ধরে নাড়ীর গতি শুনতে লাগলাম। রন্টু আর ওর মা গভীর নিদ্রায় মগ্ন। আমার নাড়ীর গতি ঠিক আছে। মল্লিকার ঘুম গভীর। বেচারির ঘুম ভাঙিয়ে আমার স্বপ্নের কথা বলতে মন সায় দিল না। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম ভোর হতে আরও ঘণ্টা দুয়েক বাকি।

৯

ভোর বেলায় মল্লিকাকে বললাম, 'আজ আর অফিস যাব না'। স্বপ্নের কথা ওর কাছে তক্ষুনি না বলে বললাম, 'আজ শরীরটা ঠিক লাগছে না'। আমি সচরাচর অফিস কামাই করি না। মল্লিকা বলল, 'বেশ ঠিক আছে। আজ রন্টুরও স্কুল নেই। একটু দেরিতেই না হয় রান্না বসাব!

—'ঠিক আছে'। আমি সায় দিলাম মল্লিকার কথায়। এরপর যা ঘটলো তা অনেকেই হয়তো কাকতালীয় বলে উড়িয়ে দেবেন। সন্ধ্যের টিভি নিউজে দেখলাম বড়ুয়া টাওয়ারে আগুন লেগে টপ তিনটে ফ্লোর ভস্মীভূত। আমি সঙ্গে সঙ্গে তুষারকে ফোন করলাম। ফোন সুইচড অফ। কৃষ্ণকলি, বিমান, সজল সকলেরই ফোন সুইচড অফ। পরে সলিল আমাকে জানালো সুজয়, কৃষ্ণকলি, বিমান এরা জিনজনই মৃত। সুজয় আমার বিয়ে ঠিক করে দিয়েছিল। আমার অনুপস্থিতিতে ও আমার টেবিলে কাজ করছিল। গতকালই কৃষ্ণকলি-বিমানের প্রেমকাহিনী নিয়ে কত খুনসুটি করেছি। মাত্র ২৪ ঘণ্টায় সব উল্টে পাল্টে দিল।

চেয়ারে বসে রাতের স্বপ্নের কথা মল্লিকাকে বললাম। বললাম সুমনা তথা মিতার সঙ্গে আমার প্রেমপর্বের কথা। আমার মনের কথা মিতাকে বলে ওকে সতর্ক করে দিয়েছিলাম কেদার-বদ্রী না যেতে। কাল রাতে যেন সেই সতর্ক বার্তা-ই দিল মিতা স্বপ্নের মধ্য দিয়ে। আমি নতুন জীবন পেলাম। শঙ্কাও রইল যে এই দুর্ঘটনার পর আমার চাকরি থাকবে তো? মল্লিকা আমাকে জড়িয়ে ধরে নারীসুলভ আবেগে চুমু খেতে খেতে আবেগে কাঁদতে লাগল খুশির আনন্দে।

(অঙ্কন : রমাপ্রসাদ দত্ত)

আদি কলকাতার বনেদিবাড়ির ঝুলন

নির্মল কর

ঝুলন এক অর্থে নরনারীর মিলনোৎসব। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে আদিবাসী সমাজের নরনারীর অবাধ মিলনকে কেন্দ্র করে যেসব উৎসবের উপলক্ষ রয়েছে, সামাজিক বিবর্তনের ধারায় সেই সবই পরিশীলিত হয়ে রাস, দোল, ঝুলন ইত্যাদি উৎসবে পরিণত হয়েছে। তার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে রাধা-কৃষ্ণের কাহিনী। এই মিলন উৎসবগুলিতে প্রকৃতি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। তাই প্রতিটি উৎসবের সঙ্গে যুক্ত হয় পূর্ণচন্দ্রের তিথি।

ঝুলন অনুষ্ঠিত হয় শ্রাবণী-পূর্ণিমায়। এই পুণ্যতিথিতে সূর্যের দক্ষিণায়ন ঘটে। এক্ষেত্রে ঝুলনের সঙ্গে 'যাত্রা' শব্দটি অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। তত্ত্বগতভাবে ঝুলন উৎসবকে যেমন করেই বিশ্লেষণ করা হোক না কেন, রাধাকৃষ্ণের মিলিত রূপকেই আমরা এই উৎসবের মধ্যে দিয়ে স্মরণ করি। ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গ ফলের আকাঙ্ক্ষায় ঝুলন উৎসব করা হয়।

সহস্রাধিক বছরের প্রাচীন বৃন্দাবনের ধর্মীয় উৎসব ঝুলন স্বীয় গৌরবে উজ্জ্বল। যেখানে হিন্দু সেখানেই ঝুলনের সমারোহ। এটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। তাই বৈষ্ণবতীর্থ নবদ্বীপ, শান্তিপুরের বিভিন্ন বাড়িতে চিরাচরিত ঐতিহ্যের সঙ্গে ঝুলনযাত্রা আচরিত হয়।

বাঙালি-সংস্কৃতির অঙ্গ এবং বনেদিয়ানার নিদর্শন-স্বরূপ ঝুলন শহর ও শহরতলীর নানা স্থানে এবং কলকাতার কয়েকটি বনেদি বাড়িতেও সেই আদ্যিকাল থেকে সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। অতীতের কৌলীন্য বর্তমানে না থাকলেও কলকাতার বিডন স্ট্রিটে ছাতুবাবু-লাটুবাবুদের ঝুলনের কথা উল্লেখযোগ্য। আনুমানিক দু'শ বছর আগে তাঁদের পিতৃদেব রামদুলাল দে সরকার এই ঝুলনযাত্রার সূচনা করেন। রামদুলালের পরবর্তী বংশধরেরা অন্যান্য পূজা এবং গাজন উৎসবের মতো ঝুলন উৎসব আজও অতীতের ঐতিহ্য অনুযায়ী অব্যাহত রেখেছেন। তাঁদের কুলদেবতা শ্রীধর জিউ শিলাকে নিয়েই এই ঝুলনযাত্রা। তিথি অনুসারে উৎসব কখনও চারদিনের, কখনও বা পাঁচদিনের। ঝুলনের ক'দিন অপরাহ্নে শ্রীধর জিউ তিনতলার মন্দির ছেড়ে নেমে আসেন ঐতিহ্যমণ্ডিত ঠাকুরদালানে। শ্রীধরের ফুলের আসনটি মালিরা প্রতিদিন নতুন করে সাজায়। ঠাকুরদালানের ভেতর অংশের সিংহাসন সরিয়ে মাঝামাঝি জায়গায় ফুলের দোলনার ওপর শ্রীধর জিউ দোলেন। দোলনার ওপর বাঁশের মাচা তৈরি করে দেবদারুর পাতা, টুনি বাল্‌ভ, শোলার গাছ, ফুল, পাখি দিয়ে কুঞ্জবন তৈরি করা হয়। দোলনার দু'পাশে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে অষ্টসখি। পুরোহিত শ্রীধর জিউ-র পুজো করে বিগ্রহকে দোলনা থেকে নামিয়ে ফুলের আসনের ওপর একটি বৃহদাকার রূপোর পদ্মফুলের ওপর বসিয়ে দেন। তারপর সদর ফটকের দেউড়ি পেরিয়ে যে-উঠোন, তার একপাশে তৈরি-মঞ্চে বসে গায়েন ও কীর্তনিয়ারা শুরু করেন কীর্তন, রাধাকৃষ্ণের পাঠ আর পালাগান। এখানে নামকীর্তন করে গিয়েছেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী, রথীন ঘোষ, রাধারাণি দেবী, রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতো প্রখ্যাতজনেরা। প্রতিদিন অনুষ্ঠানে শেষে শ্রীধর জিউকে শয়নে দেবার আগে বাতাসা হরিরলুঠ দেওয়া হয়। শেষদিনে পারিবারিক মিলনোৎসব অতটা সমারোহে সম্পন্ন না হলেও আজও ঠাকুরদালানে গানবাজনার আসরটি যথারীতি অব্যাহত আছে। মানিকতলার সাহাবাড়ির ঝুলনযাত্রার উৎসবটিও যথেষ্ট জাঁকের সঙ্গে পালিত হয়।

তবে আদি কলকাতার ঝুলনের ঐতিহ্য আজও বজায় রেখে চলেছে ১নং বাবুরাম শীল লেনের অধিকারীদের ঝুলন। পারিবারিক ইতিহাস থেকে জানা যায়, দুই শতাধিক বছর আগে কৃষ্ণমোহন অধিকারী এই বাড়ি এবং রাধাবল্লভ জিউ-র দেবালয় প্রতিষ্ঠা করে আরম্ভ করেন ঝুলন উৎসব। একাদশী থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত পাঁচদিনের এই উৎসবের জাঁকজমক তৃতীয় পুরুষ রামকানাই অধিকারীর আমলে। ইনি ঝুলন উপলক্ষে দেবালয়ে শুরু করেন ধ্রুপদ গানের আসর। তাঁর বন্ধু যদুভট্ট নাকি সেই সময় পাঁচদিন এখানে থেকে ধ্রুপদ শোনাতেন, আর পাখোয়াজে সঙ্গত করতেন স্বয়ং রামকানাই। তখন থেকেই এই ঝুলনবাড়ির প্রসিদ্ধি ধ্রুপদ-বাড়ি নামেও। ট্র্যাডিশন এখনও চলছে। তবে এখন বসে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের জমাটি আসর। আসরে আজও রীতিমতো ঠাঁট, আজও ভিড়। সংস্কৃতির আঙিনায় জাতপাতের বিরোধী বর্তমান প্রজন্মের আমন্ত্রণে এখানে ওস্তাদ রসিদ খানের মতো শিল্পীরা গান শোনাতে আসেন। প্রতিবছর হিন্দু-মুসলিম গাইয়ে-বাজিয়েতে আসর মাতিয়ে তোলাই অধিকারীদের ঝুলনবাড়ির বৈশিষ্ট্য। এঁদের কৃষ্ণ বিগ্রহটি যোদ্ধবেশে বিরাজিত।

ঝুলন উপলক্ষে বনেদিবাড়ির চত্বরে ভক্ত-সমাবেশ খুব কম হয় না। কারণ, ঝুলনের বেদিতে পুতুলের মাধ্যমে কৃষ্ণলীলা, রাধা-কৃষ্ণের বিরহ- মিলন, অষ্টসখীর শিবিকায় শ্রীকৃষ্ণ, কৃষ্ণের সাজ-মিলন, বিলাস অনন্তশয্যা, কৃষ্ণ রাইরাজা, যুগল মাধুরী, গিরি গোবর্ধন, কালীয়দমন এবং শেষদিনে নৌকাখণ্ড, এমনকী শিখারূপ শয্যাও বড় আকর্ষণ। রামায়ণ মহাভারতের যুদ্ধাংশ নিয়েও পুতুলসজ্জা করা হয়। ঝুলন উপলক্ষে কোথাও কোথাও মেলাও বসে।

আমার দেখা মিতব্যয়ী প্রচারক সুকুমারদা

উত্তমকুমার মাহাতো॥ গত ১৬ জুলাই ঠিক রাত্রি ১০টা নাগাদ এস.এম.এস. এলো— আমাদের পুরানো প্রচারক সুকুমারদা (পাত্র) আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। সুকুমারদা তাঁর বড়দা রবিদা-র (রবীন্দ্রনাথ পাত্র) হাত ধরে শাখায় এসেছিলেন। ছোটবেলা থেকে স্বয়ংসেবক হওয়ার কারণে নিজের শরীর গুরুদক্ষিণার পরের দিনই দেশমাতৃকার চরণে সমর্পণ করে চলে গেলেন। এর থেকে বড় দক্ষিণা একজন প্রচারকের কাছে আর কী-ই বা হতে পারে? শ্মশান থেকে দাহ করার পর আমরা স্নান করছি, এক পুরানো প্রচারক বললেন, সুকুমারদা একটা ছোট নৌকা নিয়ে ধীর গতিতে একটু একটু করে নিজেই দাঁড় টেনে সমুদ্রটা পার করে দিলেন। কারও সহযোগিতা নিলেন না, এইরকম ভাগ্য কত জনের হয়? বীরভূম জেলায় প্রচারক থাকার সময় সুকুমারদার কেন্দ্র সিউড়িতে ছিল। ওই সময় তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে। তাঁর সব কিছুই ছোট; শরীর, বিছানা, ব্যাগ, এমনকী থালা বাটি গ্লাস সব ছোট জিনিস ব্যবহার করতেন।

সুকুমারদা সাতের দশকের প্রচারক। সেই সময় গুরুদক্ষিণাও কম হোত। তাই অভ্যাসবশত ছোট আলু, ছোট বেগুন, ছোট মাছ বাজার করতেন। সিউড়ির দু-একজন কার্যকর্তা খুব ভালোবাসতেন সুকুমারদাকে। একদিন একজন কার্যকর্তা বলছেন ধমকের ছলে—আপনি কি ভাল কিছু বাজারে পান না? সঙ্ঘের কি সেই আগের অবস্থা আছে! দু-বেলা ডাল, ভাত, সবজী পেট ভরে খান তো, কৃপণতা করতে হবে না। সুকুমারদা সেই সময় কিছু বলতেন না। চলে যাওয়ার পর বলতেন, উত্তম, যে যাই বলুক আমাদের অত খরচ করলে হয় বল? এই ভাবে সারাজীবন কিভাবে কম খরচে পার করে দিলেন! আমরা সেভিং বক্সে সমস্ত দাড়ি কাটার সরঞ্জামের সঙ্গে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস রাখি। সুকুমারদা সেভিং বক্স ছিল— ফটো তোলার রিল থাকার খাপে। এইভাবে ফেলে দেওয়া জিনিসকেই নিজের ব্যবহার্য করে নিতেন।

অনেক অধিকারীরাই বলেন, প্রচারক-কে চেনা যায় তার কর্মক্ষেত্রে দেখে। এখনও রামপুরহাট, মল্লারপুর, কল্লেশ্বরে যান, সুকুমারদা কেমন জানতে পারবেন। এইসব এলাকাতে ঘুরতে ঘুরতে দু'-একটা ঘটনা শুনতে পেতাম। যে সব কার্যকর্তারা সুকুমারদার সঙ্গে কাজ করতেন, তাঁকে কত শ্রদ্ধা করতেন মন থেকে। এক কার্যকর্তার বাড়ীতে সুকুমারদা ভোজন ও রাত্রিবাস করবেন। হঠাৎ এসেছেন। ওই দিন সেই কার্যকর্তা শাখার প্রবাসে পাশের গ্রামে গেছেন। বাড়ীর গৃহকর্ত্রী সুকুমারদাকে বললেন, সুকুমারদা, আমাদের সঙ্গেই রাত্রিতে ভোজন করুন না। গরমের দিন ছিল, তাই বাড়ীতে ভেজা ভাত, কলাই বাটা, মুড়ি, চানাচুর, আলুভাজা দিয়ে রাত্রিরের ভোজনপর্ব শেষ হলো। ওই কার্যকর্তা প্রবাস সেরে বাড়ীতে এসে সুকুমারদাকে দেখে বললেন, কি সুকুমারদা খাওয়া হয়েছে? সুকুমারদা বলেন, হ্যাঁ হয়ে গেছে। তারপর ওই কার্যকর্তা গৃহকর্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেন, কি গো আমার প্রচারককে কি খাইয়েছ? তিনি উত্তর দেন, আমাদের সঙ্গেই উনি খেয়েছেন। তখন রেগে গিয়ে সেই কার্যকর্তা বলেন, প্রচারককে ভিজে ভাত খাইয়েছ? আজ থেকে আমি বাড়িতে গরম ভাত খাব না। আমার জানা যতদিন ওই কার্যকর্তা বেঁচে ছিলেন, রাত্রিতে কখনও গরম ভাত খাননি। একজন কার্যকর্তা একজন প্রচারককে কী চোখে দেখতেন, তা এতেই বোঝা যায়। সুকুমারদা প্রচারক পরম্পরা ঠিক ঠিক পালন করায় তাঁকে কার্যকর্তারা একজন সাধক হিসাবেই দেখতেন। এটা প্রচারক পরম্পরার চরম প্রাপ্তি। এইরকম অনেক ঘটনাই আছে যা উল্লেখ করার মতো।

শেষবারের ঘটনা, সুকুমারদার বাড়ীর সঙ্গেও আমার পরিচয় ছিল মণ্ডলকুলিতে বিস্তারক থাকার কারণে। বড়দা রবীন্দ্রনাথ পাত্রের ছোট মেয়ে পূর্ণিমা কলকাতাতে থাকে। সুকুমারদা'র সঙ্গে ওদের বাড়িতে একদিন দেখা করতে যাই। আহার সেরে ফিরে আসার সময় পূর্ণিমা বলছে, কাকু তুমি তো কিছুই নাও না, এটা নাও বলে কিছু টাকা দিচ্ছিল। কাপড় জামা দিলেও নেবে না, এটা রাখ। প্রথমে না-না বলছিলেন। পরে দু-টো ১০ টাকার নোট নিয়ে বাকী ফেরৎ করে দিলেন। ঠিক আছে, আর কিছু বলবে না। এই বলে সুকুমারদা হাঁটা দিলেন। বাসে উঠে আমাকে বলছেন, তুমি ভাড়া দেবে না। আমি দেব। দেখলে না জোর করে ওরা পয়সা দিল। ওই পয়সা এখানেই শেষ করে যাব। বাসভাড়া আর অটো ভাড়াতে ২০ টাকায় খরচ হয়ে গেল। এই ভাবেই ধূপের মতো জ্বলে জীবনটাকে ভারতমাতার চরণে সমর্পণ করে দিয়ে চলে গেলেন।

পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্তন প্রসঙ্গে

শিবাজী গুপ্ত

কিছুদিন পরপর দুটি প্রস্তাব বাঙালী রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক নেতাদের মাথায় চাগিয়ে ওঠে। এর একটি হলো পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্তন, আরেকটি বাংলা বানানের সংস্কার। বানান সংস্কারের কথা আপাতত মুলতুবী থাক, নাম পরিবর্তনের আলোচনা প্রথমে করা যাক।

পশ্চিমবঙ্গের নাম বঙ্গ, গৌড় বঙ্গ, বাংলা, রাঢ় বঙ্গ, বঙ্গদেশ, বঙ্গভূম, বঙ্গপ্রদেশ, বাঙালীস্তান ইত্যাদি রাখার প্রস্তাব শোনা যাচ্ছে; ঝাড়াই বাছাই'র জন্য কমিটিও গড়া হয়েছে। নবজাতকের নামকরণ জন্মের কয়দিন পরেই মানায়; বুড়ো খোকার নাম পরিবর্তনে প্রয়োজন এফিডেভিট। পশ্চিমবঙ্গের এই নাম কেন হলো তার ইতিহাস অনেক নেতা ও দলই আজ ভুলতে চাইছেন, কারণ তারা অনেকেই এই বিকৃত নামের (Waste Bengal) সৃষ্টির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন বা সক্রিয় সমর্থন জানিয়েছিলেন। আজ বিবেকের দংশন অনুভব করলেও উত্তর পুরুষের কাছে তাদের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা ও হীন গোষ্ঠীস্বার্থপরতার জন্য জবাবদিহি করতে হবে। তাই গা বাঁচাতে পাপ দেহে নামাবলি ধারণের বৃথা চেষ্টা।

কিন্তু দেশবাসীকে বোকা বানাতে চাইলেও বিদেশী গবেষকগণ একের পর এক তথ্যনির্ভর ও সাক্ষ্য প্রমাণযুক্ত পুস্তক রচনা করে ১৫ আগস্ট ক্ষমতা হস্তান্তরের নামে মাঝরাতের কুকীর্তির ইতিহাস রচনা করে যাচ্ছেন। ফলে দেশবিভাগকালীন দল ও নেতাদের মুখোস এমনিভাবে খুলে পড়ছে যে ইতিমধ্যেই অনেক মহাত্মার মাহাত্ম্য, পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য ও বিপ্লবীদের বিপ্লবীয়ানার রং চটে গিয়ে সব খড়ের কার্তিক বনে গেছে। বাংলা ও উর্দু এই দুই ভাষাগোষ্ঠীকে চিরদিনের মতো পঙ্গু করে দিয়ে হিন্দীভাষীদের হাতে ভারত শাসনের মৌরসী পাট্টা দেওয়ার ষড়যন্ত্র তো এক দিনের নয়, ত্রিশের দশক থেকে সার জল দিয়ে তাকে সারধান করে তোলা হয়েছে। এখন সারা দেশে শুরু হয়েছে তার বিষক্রিয়া।

এই ষড়যন্ত্র ১৯৪৭ সালে সফল হলো। তার পরিণতি বাংলা দুই ভাগ— পূর্ব ও পশ্চিম। কিছুকাল পরে পূর্ববঙ্গ নামান্তরিত পূর্ব পাকিস্তানে এবং অবশেষে বাংলাদেশ নামে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। আজ তার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললে কি হবে। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের ম্যাপ দুইখানা পাশাপাশি রাখলেই বাংলাদেশ ও সোনার বাংলা নামের তাৎপর্য সুস্পষ্ট হবে। সেখানে বিকলাঙ্গ, ধড়েমুণ্ডে প্রায় সম্পর্কশূন্য পশ্চিমবঙ্গের যে নাম-ই করা হোক, তা কানা ছেলের পদ্মলোচন নামের মতোই হাস্যকর।

এখন পূর্ববঙ্গ না-ই থাকুক; কিন্তু পশ্চিম যখন আছে, পূর্বও নামান্তরে আছে। পশ্চিমবঙ্গের নাম বদল করে ইতিহাসকে অস্বীকার করার ভীরু ব্যর্থ ও মূঢ় মানসিকতা কেন! পিতা পিতামহ বেঁচে নেই বলেই কি তাদের একদা অস্তিত্ব অস্বীকার করব? তাঁরা সশরীরে না-ই থাকুন, রক্তে আছেন, স্মৃতিতে আছেন। সুতরাং পূর্ববঙ্গ স্মৃতিতেই থাক, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের নাম লোপ করে পূর্বকে অস্বীকার করা মূর্খতা মাত্র।

আর India that is Bharat এর মতো West Bengal অনুবাদে 'পশ্চিমবঙ্গ' পালটে সোজাসুজি 'Paschim Banga' নাম রাখাই যুক্তিযুক্ত যেমন—Uttar Pradesh (উত্তর প্রদেশ), Madhya Pradesh (মধ্য প্রদেশ); এবং শাসনতন্ত্র সেভাবে সংশোধনের জন্য চাপ দেওয়া উচিত। অন্য কোনও রাজ্যের ইংরেজী ও বাংলা দুই নাম নেই।

আর যদি 'ভঙ্গ বঙ্গ' বা 'ভাঙা বাংলা' নাম রাখা যায়, তবে তা রঙ্গভরা তো হবেই, ইতিহাস ভূগোলের সঙ্গেও হবে সামঞ্জস্যপূর্ণ!

মঙ্গলনিধি

আর এস এসের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসতের বৌদ্ধিক প্রমুখ সুজয় দাসের সঙ্গে পূজা দাসের শুভ পরিণয় উপলক্ষে আয়োজিত এক প্রীতিভোজে মঙ্গলনিধি হিসেবে ১০,০০১ টাকা সুজয়ের বাবা পবিত্র দাস ও মা জয়া দাস সঙ্ঘের বারাসত জেলা সেবা প্রমুখ মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাসের হাতে তুলে দেন। অনুষ্ঠানে জেলা কার্যবাহ সুব্রত ভৌমিক উপস্থিত ছিলেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বারাসাত ২নং খণ্ডের সহকার্যবাহ সোমনাথ ঘোষের বোন সুমিতা'র শুভবিবাহ উপলক্ষে গত ২৬ জুলাই আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সুমিতা'র বাবা ও মা যথাক্রমে পরেশ ঘোষ ও লতিকা ঘোষ সঙ্ঘের জেলাকার্যবাহ সুব্রত ভৌমিকের হাতে মঙ্গলনিধি প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে বিভাগ প্রচারক আশীষ মণ্ডল ও সমাজসেবা ভারতী'র পক্ষ থেকে সনৎ বসুমল্লিক উপস্থিত ছিলেন।

যোগ্য দল হিসাবেই কোপা জিতল উরুগুয়ে

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্রাজিল বা আর্জেন্টিনা কেউই করে দেখাতে পারল না, অথচ উরুগুয়ে টেক্কা মেরে বেরিয়ে গেল। এবার আর্জেন্টিনার মাটিতে কোপা আমেরিকা কাপ অনুষ্ঠিত হয়েছিল আর স্বভাবতই ঘরের মাঠে ফেভারিট হিসেবেই শুরু করে আর্জেন্টিনা। অন্যতম ফেভারিট ছিল ব্রাজিলও। কিন্তু দুটো দলই ডুবেছে ব্যক্তিনির্ভর ফুটবল খেলে। অন্যদিকে উরুগুয়ে টিম গেম খেলে আক্রমণ-রক্ষণের চমৎকার ভারসাম্য বজায় রেখে যোগ্য দল হিসেবেই কোপা কাপ তুলে নিল। গত বছর বিশ্বকাপের সময় যে খেলা খেলেছিল উরুগুয়ে তার থেকেও নিজেদের খেলার মানকে এবার আরও উঁচুতে নিয়ে যেতে পেরেছিল, যা তফাৎ গড়ে দিল ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার মতো হেভিওয়েট দলের সপক্ষে।

দিয়োগো ফোরলান নামটার মধ্যে যেন যাদু আছে। ফোরলান জানে ঠিক কোন সময়ে পিকআপ নিতে হয়। টুর্নামেন্টের প্রথম দিকে তাকে সেভাবে খুঁজে পাওয়া যায়নি। একটু পিছন থেকে 'রোটিং' স্ট্রাইকারের ভূমিকায় খেলে দলের আক্রমণকে দুটো উইং দিয়ে পরিচালনা করেছেন। পরের দিকে অর্থাৎ নক আউটপর্বে 'রোটিং ও উইথড্রয়াল' দুটো ভূমিকাই পালন করেন। এখানেই পার্থক্য লিও মেসি, পাবলো নেইমারের সঙ্গে ফোরলানের। মেসি ও নেইমার অনেক বেশি স্কিলফুল ফুটবলার। কিন্তু তারা একটা নির্দিষ্ট গোলে অপারেট করেন। মাঝমাঠ থেকে আক্রমণ গড়ার পর সেই আক্রমণকে সুচারুভাবে 'ফিনিস' করতে ওস্তাদ মেসি, নেইমারেরা। কিন্তু ফোরলান নিজে গেম কম্পোজ করে, বল হোল্ড করে আক্রমণে উঠে এসে তা গোলে পরিণত করতে সিদ্ধহস্ত। এ যেন হল্যান্ডের সাতের দশকে বিশ্ববন্দিত জোহান ক্রুয়েফের প্রতিচ্ছবি।

উরুগুয়ে বরাবরই ডিফেন্স সংগঠন মজবুত রেখে আক্রমণে লোক বাড়ায় ও ত্রিমাত্রিক বুলেট রচনা করে বিপক্ষের ডিফেন্ডিং থার্ডে। ঝড় তোলে। বিশ্ব-ফুটবলে আবির্ভাবের সময় থেকে এভাবেই খেলে আসছে তারা। প্রথম কোপা আমেরিকা (১৯১৬) ও প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবল (১৯৩০) তারা জিতে নেয় 'কমপাউন্ড' ফুটবল খেলে। এর মধ্যে দু'বার অলিম্পিক ফুটবল (১৯২৪, ১৯২৮)-এ সোনাও তাদের ঘরে এসেছে। দেখা যাচ্ছে, বিশ্ব পর্যায়ের সব টুর্নামেন্টের সূচনাপর্বে তাদের অবিসম্বাদী দাপট। এরপর আরও একবার বিশ্বকাপ জিতেছে (১৯৫০) উরুগুয়ে। অলিম্পিক অবশ্য না জিতলেও দক্ষিণ আমেরিকার নিজস্ব চ্যাম্পিয়ানসিপ কোপা আমেরিকা সর্বাধিক ১৫ বার জিততে সমর্থ হয়েছে উরুগুয়ে। এবারের আগে ১৪ বার করে এই টুর্নামেন্ট জেতার সুবাদে উরুগুয়ে ও আর্জেন্টিনা এক বিন্দুতে দাঁড়িয়ে ছিল।

এবারের টুর্নামেন্ট অবশ্য মাপের দিক থেকে মোটেও প্রত্যাশিত উচ্চতায় পৌঁছয়োনি। লাতিন আমেরিকার ফুটবল বলতে যে ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে অর্থাৎ ছন্দবদ্ধ নান্দনিক আক্রমণ, অসাধারণ ব্যক্তি নৈপুণ্য, 'ডাউন দ্য লাইন' সর্পিল দৌড় ও কাট করে ভেতরে ঢুকে এসে উইঙ্গারদের গোল লক্ষ্য করে শট— এসব দেখা গেল কোথায়? বিক্ষিপ্তভাবে মেসি, নেইমার বা প্যারাগুয়ের রকি সান্তাক্রুজ জ্বলে উঠেছেন ও কিছু কিছু ঝলক দেখিয়েছেন। কলম্বিয়া দলটি অবশ্য অনেক আশা জাগিয়ে শুরু করেছিল। তাদের দেখে মনে হচ্ছিল সেই ১৯৯৪-র আমেরিকা বিশ্বকাপের কথা। সেবার চোখ জুড়ানো ফুটবল খেলেছিল কলম্বিয়া যদিও কোয়ার্টার ফাইনালেই ছিটকে যেতে হয়েছিল কোচের ভুল স্ট্রাটেজির খেসারত দিয়ে। এবারও ফালকাওয়ের নেতৃত্বে তাদের খেলায় ইতিবাচক ও গঠনমূলক ফুটবল খেলার প্রতিশ্রুতি ছিল। কিন্তু পেরুর কাছে অপ্রত্যাশিত হারটাই সব শেষ করে দিল।

ব্রাজিল বা আর্জেন্টিনা গত বিশ্বকাপের মতোই নিষ্প্রভ থেকেছে। তাদের খেলায় সেই ছন্দটাই ছিল না। মেসি বার্সেলোনার জগৎবিখ্যাত তারকাদের পাশে খেলে যে ভাবে একের পর এক ম্যাচ জিতিয়ে আনেন। আর্জেন্টিনার হয়ে একমাত্র বেজিং অলিম্পিকে (২০০৮) সেই খেলাটা মেলে

ধরতে পেরেছিলেন এবং সোনা জিতে তাঁর ওপর আস্থার মর্যাদা দিয়েছিলেন। কিন্তু বিশ্বকাপ ও কোপা আমেরিকা দুক্ষেত্রেই মেসি নিজের নাম ও কাপের প্রতি সুবিচার করতে পারেননি। বরঞ্চ চোখে পড়েছে মারাদোনার জামাই আগুইয়েরা ও অ্যাঞ্জেলভি মারিয়াকে। এরাই আর্জেন্টিনাকে টেনে নিয়ে গেছেন। তবে ব্রাজিলের দুই হিরো নেইমার ও পাতোকে প্রমাণ করতে হবে যে তারা কাগুজে বাঘ নন। তাঁদের রোবিনহো, কাকা বা রোনাল্ডোর উত্তরসূরী হবার যোগ্যতা আছে। এই দুটো বিশ্ববিখ্যাত দলেরই বোঝার সময় এসেছে ডিফেন্স শক্তিশালী করে মাঝমাঠ ও ফরোয়ার্ড লাইনের মধ্যে ভারসাম্য রেখে আক্রমণ তৈরি করা প্রয়োজন, যা করে দেখিয়েছে উরুগুয়ে।

শব্দরূপ-৫৯২ ঐশ্বর্য দাশগুপ্ত

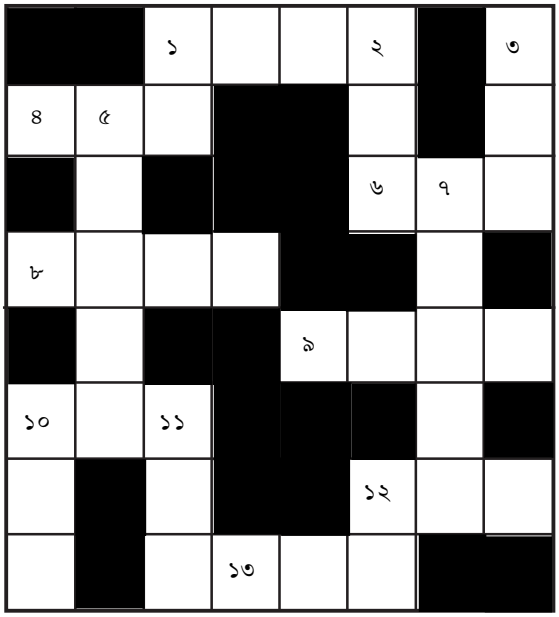

সূত্র :

পাশাপাশি ঃ ১. রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ, মধুসূদন এঁকে নিয়ে মহাকাব্য রচনা করেন, **৪.** ষোড়শ মহাজনপদের এই রাজ্যটি কালক্রমে সারা ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল, **৬.** আলংকারিক অর্থে অতি নির্মম ব্যক্তি, **৮.** 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে, ওগো—' (রবীন্দ্র), **৯.** শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যোৎসব, **১০.** দেশি শব্দে হালকা গোলাকার মিষ্টি বিশেষ, **১২.** প্রতিশব্দে হাওয়া, বায়ু, **১৩.** ঋষি গৌতমের পুত্র, তিনে ইঈ একাদশ অক্ষর।

উপর-নীচ ঃ ১. তৎসম শব্দে যজ্ঞ, **২.** আদেশপত্র, গ্রেপ্তারি পরওয়ানা, **৩.** ডাকনামে শ্রীচৈতন্যদেব, **৫.** তারাশঙ্করের বিখ্যাত উপন্যাস, **৭.** প্রতিশব্দে সহজতা, সরলতা, দুয়ে-চারে শক্তি, শেষ দুয়ে বল্লরি, **১০.** বামন ঘরণি, **১১.** আরাধনা, **১২.** একই শব্দে কথা, রোগবিশেষ।

সমাধান
শব্দরূপ-৫৯০
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

স	তী	শ	■	■	শি	শি	র
■	■	শী	তা	ং	শু	■	সা
■	ক্র	■	ড়	■	■	■	ত
■	মে	ন	কা	■	■	পি	ল
বে	ল	■	■	ভা	ব	না	■
নি	■	■	■	বু	■	ক	■
য়	■	চা	রু	ক	লা	■	■
ম	য়	না	■	■	মা	ল	ঞ্চ

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

● ৫৯২ সংখ্যার সমাধান আগামী ২৯ আগস্ট, ২০১১ সংখ্যায়

সার্ধশতবর্ষস্মরণে

স্বাধীনতা সংগ্রামী, শিক্ষাবিদ ডঃ ফুলরেণু গুহ

মিতা রায়

'কাজকেই আমি জীবনের ধর্ম বলে মনে করি এবং এখনও সেই কর্মের আহ্বানই আমার জীবনের প্রেরণার উৎস। কর্মজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে অগণিত মানুষের সংস্পর্শে এসেছি যাদের অফুরন্ত ভালোবাসা, শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা আমার চলার পথকে সহজ ও সুগম করে তুলেছে—'

প্রাক্তন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী, স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ ভাগের কর্মী ও পরবর্তী সময়ের সমাজসেবিকা শিক্ষাবিদ ড. ফুলরেণু গুহ জীবনের পথে চলতে গিয়ে উপরোক্ত উক্তি করেছিলেন। তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা অবিস্মরণীয় মুহূর্ত নিঃসন্দেহে ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট দেশ স্বাধীন হওয়ার দিন। স্বাধীনতা দিবস, অর্থাৎ ১৫ আগস্টের স্মরণের প্রাক্‌পর্বে ২০১১-র ১৩ আগস্ট সর্বজনপ্রিয় ফুলুদির শতবর্ষ সূচিত হচ্ছে। তাঁর দীর্ঘ জীবন পথ পরিক্রমায় আছে বর্ণময় ঘটনা। তিনি নিজে ছিলেন নানা প্রতিভার ও গুণের সমন্বিতা। সব কিছুই তুলে ধরা লেখার সীমিত পরিসরে সম্ভব নয়। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের কিছু কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করা যাক।

ফুলরেণু গুহর জন্ম কলকাতা শহরে মামারবাড়িতে ১৯১১-র ১৩ আগস্ট। কিন্তু তাঁর শৈশব কেটেছে অসমে। সেখানকার নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে থাকতে হয়েছে বাবার চাকরির কারণে। বাবা ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। মার ওপর দায়িত্ব ছিল তিন বোনের দেখভালের। তৎকালীন বৃটিশ সরকারের অধীনে বাবার চাকরি হলেও বাড়িতে সম্পূর্ণ স্বদেশিয়ানা বজায় ছিল। মার কাছে ছোটবেলায় বীরাঙ্গনাদের কথা, মহাপুরুষদের কথা, বিপ্লবীদের কথা গল্পের মতো শুনতেন। বাড়িতে সাহিত্যচর্চা ছিল নিয়মিত। ছোটবেলা থেকেই বিশিষ্ট মানুষদের আসা-যাওয়া ছিল বাড়িতে। স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব ছোট থেকেই তাঁকে প্রভাবিত করেছিল এবং রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে যদি পড়াশোনা না হয়, তাই বাবা মেয়েকে বিলাতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ফুলরেণু গুহকে পড়াশোনার পাঠ নানা জায়গায় নিতে হয়েছিল। শিলচরে এক ও দুই ক্লাস, গোখেল স্কুলে তিন ও ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলে চার, পাঁচ ও ছয় ক্লাস। পরে সিলেট স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। ১৯২৭-এ।

ছাত্রজীবনে জাতীয়তাবোধের উন্মেষে কয়েকটি ঘটনা বিশেষভাবে ওঁকে সাহায্য করেছিল। স্কুলে পড়াকালীন রামকৃষ্ণ মিশনের মুষ্টিভিক্ষার জন্য এক মুষ্টি চাল দেওয়া তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। বিবেকানন্দর নির্যাতিত ও অশিক্ষিতদের মধ্যে কাজের কথা তাঁকে আকৃষ্ট করে। তখন থেকেই তিনি মহিলাদের জন্য কিছু করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। এছাড়া ব্রাহ্ম গার্লসে পড়ার সময়ে প্রধান শিক্ষয়িত্রী জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলির দেশপ্রেম তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তিনি ছাত্রীদের ঘরে ডেকে দেশ-বিদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী শোনাতেন। ছাত্রী জীবনেই ফুলরেণু গুহ যুগান্তর দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। সেখানে তিনি লেখা নকল, বিপ্লবীদের আশ্রয় ও জিনিসপত্র সরবরাহ করতেন। বিশ শতকের শেষে ও ত্রিশ দশকের প্রথমে যতীন্দ্রনাথের দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ও সবরকম অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মতো মানসিক বল তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। বিদেশে থাকাকালীন প্যারিসের কাছে অ্যাবিসিনিয়ার রিফিউজি ক্যাম্পে থাকা স্পেনের যুদ্ধে সর্বহারাদের জামাকাপড় খাবার জিনিস বিতরণ করতেন। ১৯৩৮-এ প্যারিসের সরবন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি করে ইউরোপ থেকে আমেরিকা যাওয়ার বহু সুযোগ পান, কিন্তু দেশের কাজ করার প্রতি আগ্রহ তাঁকে স্বদেশে ফিরে আসতে বাধ্য করেছিল।

তাঁর জীবনে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রভাব ছিল। নেতাজী সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছেন : 'নেতাজির কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ে, মৃদু অথচ আত্মপ্রত্যয় যুক্ত অভিভাষণ, যা আমি অনেকবার শুনেছি। ১৯৪৯-এ স্বাধীনতা দিবসে আমাকে বেতারভাষণ দিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়। আমার বক্তব্যে আমি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার যুদ্ধে নেতাজির অবদানের কথা এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বলেছিলাম।'

১৯৩৮-৩৯-এ খিদিরপুর ডকে মেডিকেল ইউনিট খুলে কাজ করতে থাকেন। পতিতালয়ের মেয়েদের চরম দুরবস্থা দেখে তাদের সবদিক থেকে একটা ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে এদের জন্য কাজ করেছেন। বৃদ্ধাবাস তৈরি করার চিন্তা প্রথম ড. ফুলরেণু গুহর মাথায় আসে। বৃদ্ধ বাবা-মায়ের অসহায়তার কথা ভেবেই তাঁর এই পরিকল্পনা।

১৯৩৩ সাল থেকেই রাজনৈতিক কাজকর্মের মধ্য দিয়ে ড. বীরেশ গুহর সঙ্গে আলাপ হয়। ৪২-এর আন্দোলন এবং ৪৩-এর দুর্ভিক্ষর পটভূমিতে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব হয়নি। ৪৫-এর ১৭ জুলাই রেজিস্ট্রি করে দু'জনের বিয়ে হয়। স্বামী ড. বীরেশ গুহ সম্পর্কে বলছেন তিনি— ১৯৩৬-এ ড. বীরেশচন্দ্র গুহ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত রসায়ন বিভাগে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। প্রাক্-স্বাধীনতাকালে আমরা দু'জনেই চেয়েছিলাম দেশের জন্য, স্বাধীনতার জন্য কাজ করতে। দেশ স্বাধীন হলে আমাদের লক্ষ্য হলো নতুন ভারতবর্ষকে গড়ে তোলার কাজে নিজেদের সর্বশক্তি নিয়োজিত করা। আমার স্বামীর মৃত্যুর পর যাঁরা ছাত্রজীবনে লন্ডনে ড. গুহর বন্ধু ছিলেন তাঁরা অনেকেই বলেছেন—বীরেশ বলত, 'বিয়ে করব কী না জানি না, বিয়ে করলে এমন মেয়েকে বিয়ে করব যে আমার ফাঁসি বা মৃত্যু হলে চোখে জল নিয়েও দেশের কাজ করে যাবে।' ফুলরেণু গুহ ছিলেন সেধরনের মহিলা।

মন্ত্রী হবার পর সারা ভারতবর্ষ বহু স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পরিচিত হন। তিনি আরও বলেন : মন্ত্রী হবার পর বুঝেছি জনগণ এবং বিরুদ্ধ পক্ষের মনোভাব ঠিকমতো না জানলে তাদের সবরকম খবরাখবর না রাখলে ভালো করে কাজ করা যায় না। রাজনীতির ক্ষেত্রে এও দেখেছি সমচিন্তা ও সম কর্মধারা ঠিকমত না হলে সংগঠন ধরে রাখা যায় না। তাই সংগঠনের যিনি পরিচালক হবেন তাঁর সংগঠনের জন্য চিন্তাভাবনা গঠনমূলক হতে হবে।

তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে প্রাক্-স্বাধীনতার যুগে স্বাধীনতার জন্য যে ব্যাকুলতা ছিল, স্বাধীনতার পরে দেশ গড়ার কাজে মানুষের কিন্তু সে ব্যাকুলতা নেই। তবে তিনি ছিলেন আশাবাদী। তাই বলেছিলেন, ভারত যখন স্বাধীন হয়েছে, তখন সৎ কাজের মধ্য দিয়ে ভারত মাথা তুলে দাঁড়াবে— এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

মুম্বাই সন্ত্রাস

৩২ মাসের ব্যবধানে দেশের বাণিজ্যিক রাজধানীতে পুনরায় মুসলিম জঙ্গি ব্লাস্ট। নিহত ১৮ আহত মোট ১১৩, গুরুতর আহত ২৩ জন। ৪৮ ঘণ্টা পরেও কোনও গোয়েন্দা সংস্থা বলতে পারেনি ঠিক কোন্ গোষ্ঠী এটা করেছে। সরষের মধ্যে ভূত থাকলে ভূত তাড়ানো যায় না। সিমি, ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন ভারতীয় মুসলিম পরিবার থেকে সংগ্রহ করা প্রশিক্ষিত আতঙ্কবাদী ভারতের সর্বত্র বিরাজমান! তারা কেউ কোনও মন্ত্রীর ভাতিজা, কোনও এম পি-র বেটা অথবা কোনও নেতার বেটী বা যে কেউ হতে পারে। ইং-চ্যানেল গুলি Anger, Determination Cowards attack বলে দেখাচ্ছেন, প্রচার করছেন কিন্তু এসব সময়ের সঙ্গে কোথায় উড়ে যায়। হিন্দু মরে, সারাজীবন আহত হয়ে পড়ে থাকে, কালো টাকার সরকার কিছু খয়রাতি দেয়। বোকা সাধারণ মানুষ বুকে চাপা ব্যথা নিয়ে একদিন বিদায় নেয়। এই কালো টাকার সরকারের মুসলিম জঙ্গি ধরা বা শাস্তি দেওয়ার কোনও ইচ্ছাই নেই। আছে হিন্দুদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা বিরোধী বিল পাশ করানোর। মুসলিমরা দাঙ্গাবাজ বলে খ্যাত, কিন্তু হিন্দুরা দাঙ্গাবাজ একথা কোনও মুসলমানও বলে না। কিন্তু বর্তমান দিল্লীর সরকার হিন্দুবিরোধী সরকার। কারণ রয়েছে পণ্ডিত নেহরুর লেখা Constitution of India গ্রন্থে। সেখানে তিনি লিখেছেন "I am Moslem by Culture, English by education and Hindu by accident, তাই মুসলমান তোষণ চলছে, চলবে। তাই তার কন্যা ফিরোজ খান (এমপি)-কে বিয়ে করেছিলেন। শোনা যায় ফিরোজ খান পুনরায় বিবাহ করেছিলেন।

হিন্দুদের ১০০ শতাংশ ভোট দিয়ে নির্বাচনে জেতাতে হবে। রাষ্ট্র যখন একতাবদ্ধ হবে তখন আমরাও পাকিস্তানে ঢুকে দাউদ ইব্রাহিমকে মারতে পারবো। এখন যারা দিল্লীর সরকারে আছে তারা কাপুরুষ। এক রামদেবের ঠেলায় ৪ জন পূর্ণ মন্ত্রী দিল্লীর বিমান বন্দরে রেড কার্পেট অভ্যর্থনা করে আবার পুলিশ দিয়ে অধিক রাত্রে মেরে তাড়ায়। প্রায় পুরো মন্ত্রিসভাই দুর্নীতিগ্রস্ত। ভারতে মুসলীম তোষণ ও ভোট ছাড়া কংগ্রেস-তৃণমূলসহ কোনও দল দাঁড়াতে পারবে না। সংবাদে প্রকাশ কলকাতার বেনেপুকুরের আবদুল্লা বলে এক ব্যক্তির সন্ধান চলছে যে ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের মুখ্য নেতার ঘনিষ্ঠ বলে জানা যাচ্ছে। বর্তমানের কেন্দ্রীয় সরকার এমনই নিকম্মা যে সুপ্রীম কোর্ট কালো টাকা বিষয়ে এস আই টি-কে দায়িত্ব দিয়েছে তদন্ত করতে। এই সর্বোচ্চ আদালতের মনিটরিংএ মন্ত্রীদের জেলে যেতে হয়েছে। তবু এরা গদি আঁকড়ে পড়ে আছে। আফজল গুরুর ফাঁসি দিতে এরা ভীত। কোটি টাকা খরচ হচ্ছে কাসভের পিছনে তবু তাকে শাস্তি দিতে পারছে না। সুতরাং ভালো রকমের ঘাড়ধাক্কা না খেলে এদের শিক্ষা হবে না।

—বৈদ্যনাথ ঘোষ, বারাসাত।

মুসলিম ও তৃণমূলের সন্ত্রাস

গত ২০ জুনের স্বস্তিকাতে গড়বেতায় তৃণমূলের সন্ত্রাস পড়লাম। আসল কথা চাষজমি দখল নিয়ে গোলমাল। মুসলমানদের জমি ন্যাকড়াশোলের সর্দাররা সিপিএম-এর মদতে গত ৩৫ বছর জবর দখল করে রেখেছে। জমির মালিকরা তাদের জমি হাতে পেয়ে দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা করে চলেছে। হাইকোর্ট মামলাকারীদের জমি দখলে রায় দিয়েছে। সিপিএম- এর মদতে সর্দাররা আইন আদালতের রায় মানেনি। জমির মালিকদের বাকি জমি থেকে ২ কিলোমিটার দূরে, সর্দারদের বাড়ির লাগোয়া এই জমি। ২২ বিঘা জমির মায়া মুসলমানরা ছাড়তে পারেনি। সিপিএম-এর রাজত্বে পশ্চিমবাংলা থেকে উৎখাত হতে মুসলিম তৃণমূলীরা জমির মালিকদের পক্ষ নিয়ে জমি দখলের চেষ্টা চালাতে থাকে। মোটর সাইকেল বাহিনী জমিতে এসে হামলা করলে সর্দাররা তাদেরকে তাড়িয়ে দেয়। পরে আরও বেশি সংখ্যক এসে হামলা করে। ১২-১৪ জন আহত হয় ও ১ জন মারা যায়। (লক্ষ্মীকান্ত সর্দার)। তৃণমূলের পাণ্ডারা নিহত পরিবারকে ১০ হাজার টাকা, ১ কুইন্টাল চাল, শ্রাদ্ধের কাপড়াদি দিয়ে তাদের সান্ত্বনা দিয়েছে। ঘর দুয়োর ভাঙচুর কিছু হয়নি। অন্য হিন্দু গ্রাম এই বিষয়ে মাথা ঘামায়নি। কারণ সর্দাররা সমাজবিরোধী বলে পরিচিত। কারণ ন্যাকড়াশোল মৌজায় অনেকের অনেক জমি দখল করে আছে (১০, ১২ বিঘা জমি)। এছাড়া বনবিভাগের অনেক জমিও দখল করে রেখেছে। তৃণমূলের এখন উভয় সংকট। কারণ সর্দারদের পক্ষ নিলে গড়বেতা সিপিএমের সমর্থক ১নং ব্লকে ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের মুসলমানরা চটে যেতে পারে। টি এম সি ভাবছে ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত আবার না সি পি এম-এর পতাকা তুলতে হাজির হয়। টি এম সি-তে মুসলমানদের উপস্থিতি বেশি। কিন্তু এখানে হিন্দু-মুসলমান ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিলে টি এম সি-র পক্ষ থেকে সমর্থন তুলে নিতে পারে।

—পিয়ালী ঘোষ, গড়বেতা।

অশনি সংকেত

বাম সরকারের অবসানের পর রাজ্যে তৃণমূল জোট সরকারের কাছে প্রশাসনে স্বচ্ছতা, শিক্ষায় মানোন্নয়ন, শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও গণতান্ত্রিক অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন প্রত্যাশা করাটাই স্বাভাবিক। তবে রাতারাতি রাজ্যের হাল পরিবর্তনের আশা করাটাও অন্যায়। অবশ্যই তা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। কিন্তু নবগঠিত রাজ্য সরকার প্রশাসন, শিল্প বা শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে এমনভাবে সিদ্ধান্ত বা চিন্তা করছে যেন রাজ্যের আমূল পরিবর্তন শুধু সময়ের অপেক্ষা। সম্প্রতি রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষার অধিকার আইন মেনে সরকারি ও সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বার্ষিক পরীক্ষা বাধ্যতামূলক না করার প্রস্তাব দিয়েছেন। স্বাভাবিক ভাবেই শিক্ষামহলে এধরনের প্রস্তাবে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বিগত বাম সরকারের আমলে শিক্ষার মানের ক্রমাবনতি হয়েছিল। এখন প্রশ্ন হলো তৃণমূল জোট সরকারও কি একই পথের পথিক? পরীক্ষা ব্যবস্থা না থাকলে কি শিক্ষার যথার্থ মূল্যায়ন করা সম্ভব? শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধ না জন্মালে কি প্রকৃত শিক্ষালাভ করা যায়? এর আগে বাম সরকার প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি তুলে দিয়েও পুনরায় চালু করে, শিক্ষাবর্ষকে পুনরায় জানুয়ারী থেকে শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করে। বাম সরকারের আমলে এই তৃণমূল নেতৃত্বই শিক্ষানীতি নিয়ে বিভিন্ন আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। সেই তৃণমূল জোট সরকারই ভুল শিক্ষানীতির পথে হাঁটতে চলেছে। অথচ তৃণমূল নেত্রী তথা মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষার মানের উন্নয়নের স্বার্থে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে চাইছেন। কিন্তু ইউনিট টেস্ট সহ বার্ষিক পরীক্ষা তুলে দেওয়ার ভাবনা কি শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষণ? পাশফেল প্রথা না থাকলেও পরীক্ষা পদ্ধতির মাধমে শিক্ষার্থীদের মেধা অন্বেষণ করা সম্ভব হোত। কিন্তু যদি পরীক্ষা পদ্ধতিরই অবলুপ্তি ঘটে তবে শিক্ষার শিক্ষণীয় বিষয়গুলোও গুরুত্বহীন হয়ে যাবে তা বলা যায়। এহেন ব্যবস্থায় শিক্ষা পদ্ধতি প্রহসনে পরিণত হলেও বলার কিছু থাকবে না। শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপ নিলে তবেই শিক্ষার প্রকৃত মানোন্নয়ন সম্ভব। কিন্তু রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর এহেন প্রস্তাবে শিক্ষাক্ষেত্রে অশনি সঙ্কেতের বার্তা বয়ে আনতে পারে। তাহলে রাজ্যবাসীর সঙ্গেও বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে।

—সমীর কুমার দাস, দ্বারহাট্টা, হুগলী।

Swastika RNI No. 5257/57
8 August - 2011
Registration No. Kol. RMS/048/2010-2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O./SSRM-Kol. RMS/RNP-048/LPWP-028/2010-12

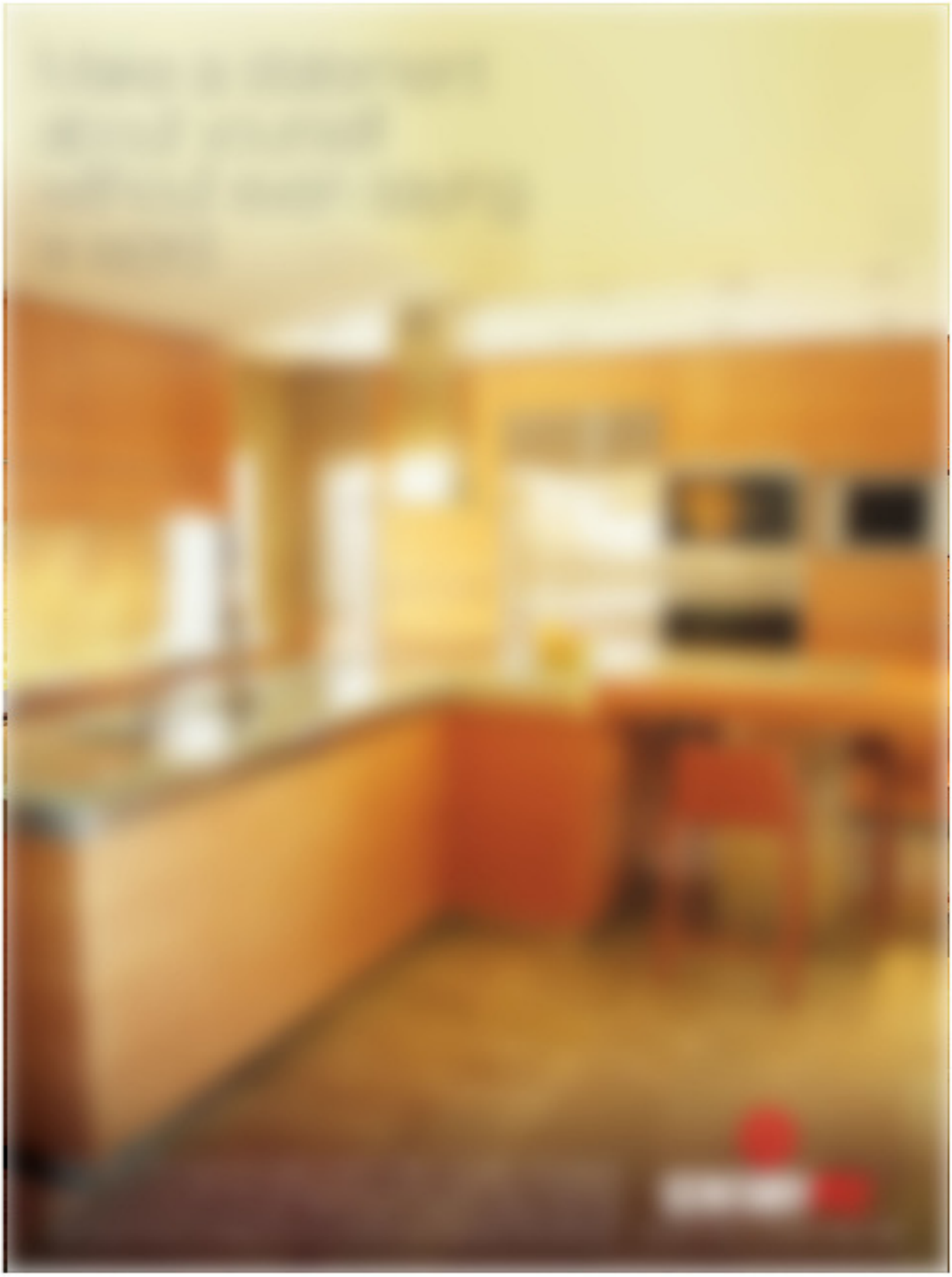

দাম : ৫.০০ টাকা